মণিরা ও দস্যু বনহুর

রোমেনা আফাজ

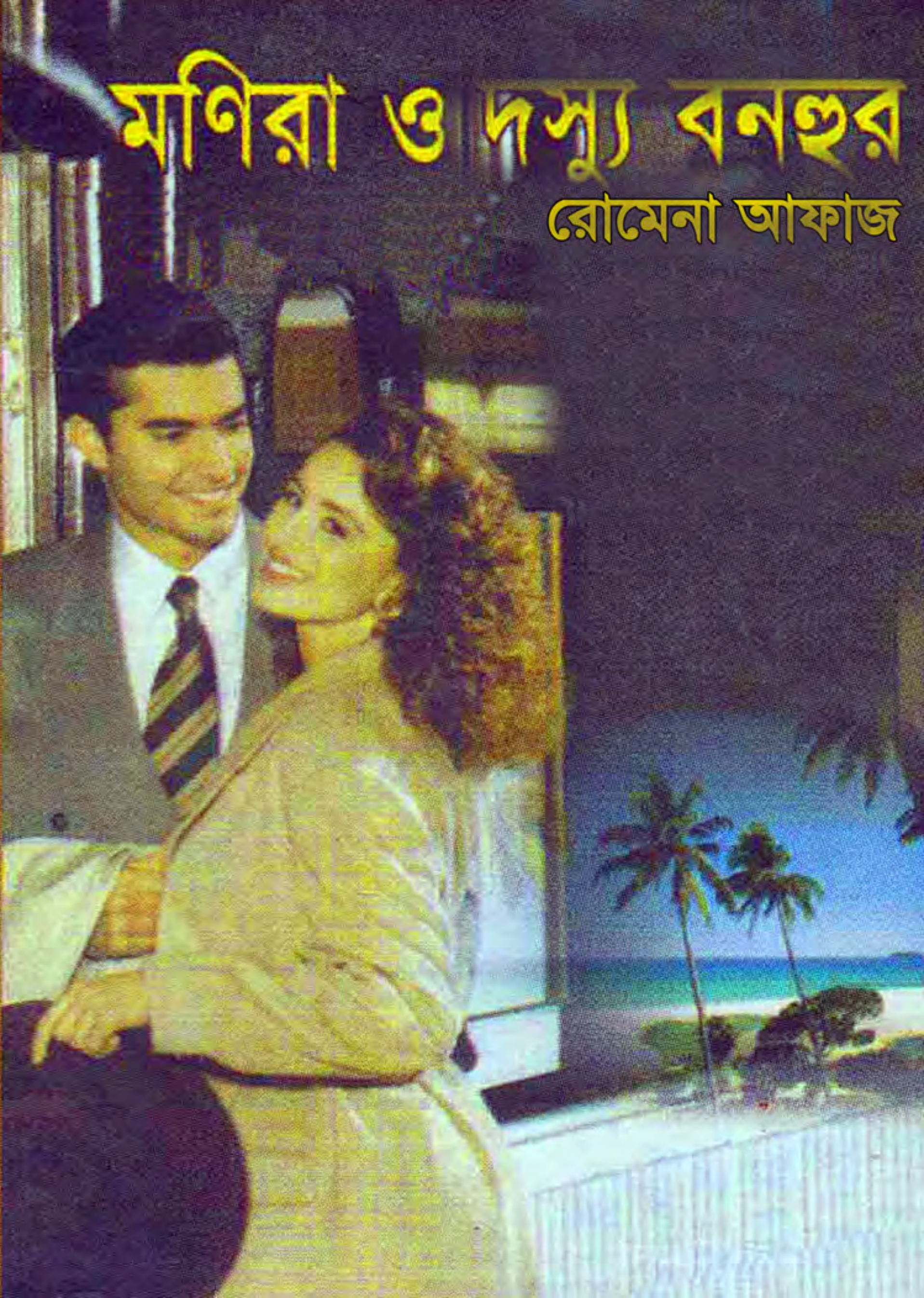

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ মার্চ, ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

□

দস্যু বনহুর মনিরার ঘোমটায় ঢাকা মুখখানা তুলে ধরে। বড় চাচার বাড়ির শাড়ি-অলঙ্কার এখনও তার দেহে শোভা পাচ্ছে। নববধুর বেশে মনিরাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে।

দস্যু বনহুরের শরীরে জমকালো দস্যু-ড্রেস? নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুর মনিরার চন্দন-আঁকা মুখখানার দিকে।

মনিরা লজ্জাবনত দৃষ্টি তুলে তাকায় বনহুরের মুখে। চার চক্ষুর মিলন হয়। মনিরা দৃষ্টি নত করে নেয়। আজ তার আনন্দের সীমা নেই! যাকে এতদিন কাছে পাবার জন্য সদা-সর্বদা উম্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করে এসেছে, যাকে সে শয়নে-স্বপনে কামনা করে এসেছে, তাকে আজ অতি কাছে ,অতি আপনজন হিসেবে পেয়েছে। মনিরার কাছে সব যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে–কি ভাবছো মনিরা?

মনিরা বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলে ভাবছি, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো।

উহুঁ স্বপ্ন নয়—সত্য।

এত সুখ আমার সইবে তো!

মনিরা!

মনির, জানো না, তুমি আমার কত সাধনার, কত কামনার। ভয় হয় আবার যদি তোমাকেই হারাই।

হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে বনহুর— অদ্ভুত সে হাসি!

মনিরা বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তন্ময় হয়ে, যত দেখে ততই যেন ওকে দেখার সাধ হয়, এত সুন্দর বুঝি মানুষ হয় না।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে—কি দেখছ?

আমার জীবনের আরাধ্য দেবতাকে।

মনিরা----

বল?

এ তুমি কি করলে মনিরা! নিজের জীবনটা কেন তুমি নষ্ট করলে?

নষ্ট! কি বলছ তুমি?

দস্যু বলে সবাই যাকে ঘৃণা করে, পুলিশমহল যাকে গ্রেফতার করার জন্য অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেশবাসী যার নামে আতঙ্কগ্রস্ত তাকে তুমি স্বামী বলে গ্রহণ করলে!

এ আমার পরম ভাগ্য। দস্যু বনহুরকে সবাই যেমন ঘৃণা করে তেমনি করে শ্রদ্ধা। পুলিশমহল অহরহ খুঁজে ফিরলেও জানে তারা দস্যু বনহুরকে

গ্রেফতার করা কত কঠিন। দেশবাসী দস্যু বনহুরের নামে আতঙ্কগ্রস্ত, হলেও তাকে দেখার একটু খানি লোভ সকলের মনে ফুলের সুবাসের মতই জেগে রয়েছে। তুমি যে সবার কত কামনার সে তুমি বুঝবে না।

বনহুর মনিরার আবেগভরা কণ্ঠে মুগ্ধ হয়। মাথার পাগড়ীটা খুলে পাশের টেবিলে রাখে।

মনিরা বনহুরের জামার বোতাম খুলে দেয়।

বনহুর মনিরার শয্যায় শুয়ে পড়ে।

মনিরা বনহুরের পা থেকে জুতো জোড়া খুলে রাখে।

বনহুর এবার মনিরাকে টেনে নেয় কাছে—এসো।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রাখে।

ভোরের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। পাখির কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে ধরণী। অজানা ফুলের সুরভি মুক্ত জানালাপথে সাদর সম্ভাষণ জানায় মনিরা ও বনহুরকে।

কুয়াশার ফাঁকে পাইনগাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মৃদুমন্দ বাতাস শিহরণ জাগায় তার পাতায় পাতায়। হিমশীতল রাতের শিশিরবিন্দুগুলো দুর্বাশিরে মুক্তার মত চিকমিক করে ওঠে।

দূরের কোনো মসজিদ থেকে ভেসে আসে মোয়াজ্জেমের কণ্ঠের ধ্বনি। অতি সুন্দর মোলায়েম সে সুর। চৌধুরীবাড়ির কন্দরে কন্দরে সেই সুরের আবেশ এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনি জাগে.... আল্লাহু আকবার।

মনিরা আবেগ মধুর কণ্ঠে বলে—ভোর হয়ে গেছে!

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়, পাগড়ীটা মাথায় দিয়ে বলে তাজ আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

মনিরা বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে— আবার কবে দেখা পাব তোমার?

যখন তুমি আমাকে স্মরণ করবে তখনই।

সত্যি?

হ্যাঁ মনিরা।

যাও।

বনহুর মনিরার চিবুক উঁচু করে ধরে বলে—খোদা হাফেজ।

মনিরা অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করে— খোদা হাফেজ।

বেরিয়ে যায় দস্যু বনহুর।

মনিরা ছুটে গিয়ে মুক্ত জানালায় ঝুঁকে পড়ে দেখে।

বনহুর তখন তাজের পিঠে চেপে বসেছে।

মনিরা অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে।

বনহুর তাজের পিঠে বসে ফিরে তাকায় মনিরার কক্ষের মুক্ত জানালার দিকে।

মনিরা হাত নাড়ে।

বনহুরের অশ্ব সামনের দু'পা উঁচু করে আনন্দসূচক শব্দ করে ওঠে, তারপর ছুটতে শুরু করে।

মনিরা ফিরে আসে শয্যার পাশে। অভূতপূর্ব একটা আনন্দ তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আজ সে নিজকে ধন্য মনে করে। দুনিয়ার কেউ না জানুক, সে জানে দস্যু বনহুর তার স্বামী!

মনিরা বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে! বনহুরের কথাগুলো তার কানের কাছে ভেসে উঠে। একটু পূর্বে বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের ছোঁয়া এখনও যেন তার দেহে লেগে রয়েছে। দোলা জাগায় তার মনে। ভাবে সে, তার মত ভাগ্যবতী নারী আর কে আছে!

◆

দস্যু বনহুর দক্ষিণ হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে তার নিজস্ব পাতালপুরীর আস্তানার একটি কক্ষে প্রবেশ করল। উজ্জ্বল দীপ্ত তার মুখমণ্ডল। শরীরে জমকালো ড্রেস, মাথায় কালো পাগড়ী।

যে কক্ষে দস্যু বনহুর এই মুহূর্তে প্রবেশ করলো, সেটা তাঁর পাতালপুরীর গোপন কক্ষ। এ কক্ষে বনহুর তার বন্দীদের আটক করে রাখে। দস্যু বনহুর এবং তার বিশ্বস্ত দু'একজন অনুচর ছাড়া আর কেউ এ কক্ষে প্রবেশ করতে পারে না।

বনহুর জ্বলন্ত মশাল হাতে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ওদিকে একটা চোরা-কুঠরী রয়েছে। বনহুর মশাল নিয়ে সেই চোরা-কুঠরীর সামনে এসে দাঁড়ায়। দেয়ালের একটা জায়গায় চাপ দিতেই চোরা-কুঠরীর দরজা খুলে যায়। একটা নীলাভ আলো ছিটকে পড়ে দরজার বাইরে। বনহুর প্রবেশ করে এবার সেই কুঠরীতে।

সুন্দরভাবে সজ্জিত সেই চোরা-কুঠরীর একপাশে একটি খাট পাতা রয়েছে। দুগ্ধফেননিভ বিছানায় শায়িত এক ভদ্রলোক।

দস্যু বনহুর সেই খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, গম্ভীর শান্ত গলায় ডাকলো—মিঃ আলম, এবার আপনার ছুটি।

বিছানায় উঠে বসলেন মিঃ আলম, তাকালেন দস্যু বনহুরের দিকে। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন, একে যেন কোথাও দেখেছেন ইতোপূর্বে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল সেই প্রথম দিনের কথা, যেদিন তিনি এ শহরে প্রথম এসে পৌঁছেছিলেন, আশ্চর্য হয়েছিলেন এরোড্রামে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে কেউ আসেনি। এমনকি বন্ধু মিঃ শঙ্কর রাও পর্যন্ত আসেন নি।

ব্যাপারটা তাঁর অত্যন্ত বিস্ময়কর লেগেছিল। তিনি আসার পূর্বে টেলিগ্রাফ করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, অথচ এরোড্রামে তাঁকে সম্ভাষণ জানাতে একজন পুলিশ অফিসারও আসেন নি। ব্যাপার কি মিঃ আলম যখন এরোড্রামে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছেন, এমন সময় এক যুবক এগিয়ে এসে হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিল—আমি কিঙ্কর রাও, আপনার বন্ধু শঙ্কর রাওয়ের ছোট ভাই। মিঃ আলম তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেছিলেন— আপনি কিঙ্কর রাও? আপনার বড় ভাই এলেন না কেন? জবাব দিয়েছিল এই যুবক— দাদার অসুখ, তাই আমাকে পাঠিয়েছেন। আসুন—আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।

মিঃ আলম বিনা দ্বিধায় যুবকের গাড়িতে উঠে বসেছিলেন সেদিন। অনেক দিন পর বন্ধু শঙ্কর রাওয়ের সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন মিঃ আলম। তিনি গাড়িতে বসে নতুন শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে চলেছিলেন। কখন যে গাড়ি শহরের পথ ছেড়ে নির্জন পথে চলতে শুরু করেছিল খেয়াল ছিল না তাঁর। হঠাৎ বলে উঠেছিলেন মিঃ আলম— শঙ্কর বুঝি শহরের বাইরে থাকে? ড্রাইভ আসন থেকে জবাব দিয়েছিল এই যুবক— হ্যাঁ দাদা অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে শহরের বাইরে থাকতে হয়।

তারপর বেশ মনে আছে মিঃ আলমের, একটি সুমিষ্ট গন্ধ তাঁর নাকে প্রবেশ করায় কেমন যেন ঝিম ঝিম করেছিল মাথাটা, ধীরে ধীরে চোখ দুটো মুঁদে এসেছিল তাঁর। তারপর আর কিছু মনে ছিল না, জ্ঞান হবার পর দেখেছিলেন সুন্দর নরম একটি বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন, কতক্ষণ শুয়ে শুয়ে ভেবেছিলেন তিনি-এ কোথায় শুয়ে আছেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না। প্রায় গোটা দিনটাই তার মনে পড়েনি কিছু। পরদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে বসতেই সব কথা স্মরণ হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলেন, এখন তিনি বন্দী। কিন্তু কেন তাঁকে এভাবে আটক করা হয়েছে? যে তাকে এরোড্রাম থেকে শঙ্কর রাওয়ের ভাইয়ের পরিচয় দিয়ে নিজে ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছে, সে-ই যে তাঁকে এভাবে আটক করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কে সেই যুবক, কি তার উদ্দেশ্য, কেন তাঁকে এভাবে আটকে রেখেছে, ভেবে পাননি মিঃ আলম। যুবক যেই হউক, সে যে উদ্দেশ্যেই তাঁকে বন্দী করে রাখুক, তাঁর ওপর কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। যে কক্ষে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছে সে কক্ষটি অতি সুন্দর। মূল্যবান আসবাবপত্রে সজ্জিত। কক্ষটা খুব বড় নয়। কক্ষের দেয়াল ফিকে সবুজ। কোন জানালা না থাকলেও কক্ষে আলো বা বাতাসের কোন অভাব নেই। যদিও প্রাকৃতিক আলো বা বাতাসের প্রবেশ সেখানে অসাধ্য তবুও

বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে এসবের। একপাশে বইয়ের সেলফ, তাতে নানা ভাষায় লিখিত নানা ধরনের মূল্যবান বই। টেবিলে নানারকম ফলমূল সাজানো। এমন কি গরম দুধও ছিল সেখানে, কিন্তু এই একটি বছরের মধ্যে তিনি মানুষের মুখ দেখতে পাননি। ঠিক সময়মতো টেবিলে খাবার, ফলমূল এবং দুধ যে কোথা থেকে আসত তিনি বুঝতে পারতেন না। ভেবে ভেবে অবাক হতেন। আজ এই যুবককে দেখে যেমন বিস্ময়, তেমনি হতবাক হন মিঃ আলম।

দস্যু বনহুর হেসে বলে— আপনি মুক্ত মিঃ আলম, আমার কাজ শেষ হয়েছে।

মিঃ আলম রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—কে আপনি?

আমি শঙ্কর রাওয়ের ছোট ভাই কিঙ্কর রাও নই— আমি দস্যু বনহুর।

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠেন মিঃ আলম—দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ।

দস্যু বনহুর লক্ষ্য করল— মুহূর্তে মিঃ আলমের মুখমণ্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। চোখ দুটোতে ফুটে উঠলো একটা ভয়ার্ত ভাব। দস্যু বনহুরের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে ঢোক গিললেন তিনি।

দস্যু বনহুর মৃদু হেসে বলল দস্যু হলেও আমি মানুষ— আমারও হৃদয় আছে। আপনি নির্দোষ, দস্যু বনহুর কোনদিন নির্দোষকে নির্যাতন করে না। মিঃ আলম আপনাকে এতদিন আটক করে রাখার জন্য আমি খুবই দুঃখিত।

মিঃ আলম অবাক হয়ে ভাবেন, অবাক হয়ে দেখেন, একি তিনি স্বপ্ন দেখছেন। যে দস্যু বনহুরের ভয়ে দেশবাসীর মনে গভীর আতঙ্ক, যে দস্যু বনহুরের ভয়ে মানুষ স্বাভাবিকভাবে পথ চলতে পারে না ধনীদের চোখের ঘুম যে দস্যু বনহুর কেড়ে নিয়েছে— এই সেই দস্যু বনহুর।

মিঃ আলম নির্বাক চোখে তাকিয়ে থাকতেন বনহুরের মুখের দিকে। তিনি সুদূর লণ্ডনে বসে দস্যু বনহুরের নাম শুনে এসেছেন। যে দস্যু বনহুরকে নিয়ে দেশময় সাড়া পড়ে গেছে, এই সেই দস্যু! মিঃ আলম নিজেও সুপুরুষ, কিন্তু বনহুরের মত সুন্দর চেহারা এর পূর্বে দেখেছেন বলে মনে হয় না তাঁর।

মিঃ আলমকে তার দিকে অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে দস্যু বনহুর কি দেখছেন? উঠুন।

মিঃ আলম উঠে দাঁড়ান।

দস্যু বনহুর বলল—আপনি তৈরি হয়ে নিন। বনহুর এবার দেয়ালের একটা জায়গায় মৃদু চাপ দেয়, সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে একটা ছোট্ট দরজা বেরিয়ে আসে। বনহুর দরজার দিকে দেখিয়ে বলে—যান, ওর ভেতর গিয়ে আপনি ড্রেস পাল্টে নিন। শেভ করার সরঞ্জামও আছে, কোন অসুবিধা হবে না।

মিঃ আলম কোন কথা না বলে সেই ছোট্ট দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। অবাক হলেন সেই কক্ষে প্রবেশ করে। অতি সুন্দর একটি কক্ষ। কক্ষে নানারকম পোশাক-পরিচ্ছদ স্তরে স্তরে সাজানো। একদিকে প্রসাধনের যাবতীয় আসবাবপত্র রাখা হয়েছে। একধারে মস্তবড় আয়না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজকে দেখেন মিঃ আলম। মুখে তাঁর খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুলগুলো রুক্ষ, শরীরে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য এর কারণ আছে। মিঃ আলম এখানে বন্দী হবার পর তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনরকম অসুবিধা হয়নি। পুষ্টিকর খাদ্য তাঁর স্বাস্থ্যকে পূর্বের ন্যায় সুস্থ-সবল রেখেছে।

◆

মিঃ আলম যখন সেই ছোট্ট দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর শরীরে মূল্যবান নতুন ড্রেস। ক্লিন শেভ-ছিমছাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! আলম সাহেব চারদিকে তাকালেন, এটা তো পূর্বের সেই কক্ষ নয়! কক্ষটা দিনের আলোয় ঝলমল করছে। সামনের মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরেটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঐ তো নীল আকাশের কিছুটা অংশ তাঁর নজরে পড়ছে। মিঃ আলম হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, এ কি করে সম্ভব হলো? তবে কি এসব যাদু। কিন্তু দস্যু বনহুর কই? কেউতো নেই সেখানে! হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে একটা লোক শরীরে তার ড্রাইভারের ড্রেস। লম্বা সেলাম ঠুকে বলে—স্যার, আসুন —গাড়ি অপেক্ষা করছে।

মিঃ আলম তাকালেন ড্রাইভারের দিকে, সম্পূর্ণ নতুন লোক।

মিঃ আলম ড্রাইভারকে অনুসরণ করলেন।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই আনন্দে আপ্লুত হলেন, একটি বছর পর তিনি মুক্ত বাতাসের সন্ধান পেলেন, স্বচ্ছ আলো আর মুক্ত হাওয়া তাঁর মনে এক অপূর্ব অনুভূতি বয়ে আনলো। তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন।

গাড়িতে বসে ভাবতে লাগলেন এ কি করে সম্ভব! এতদিন যে কক্ষে তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন, সে কক্ষ পৃথিবীর বুকে নয়, কোনো পাতালপুরীর গোপন কক্ষ ছিল সেটা। কিন্তু ড্রেসিং রুম থেকে বের হবার পর কি করে সে কক্ষ উধাও হলো ভেবে পান না।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো, তিনি যখন ড্রেস পাল্টে আয়নার সামনে এসে দঁড়ালেন তখন তাঁর পায়ের নিচে মেঝেটা যেন একটু নড়ে উঠেছিল। তিনি মনে করেছিলেন ও কিছু নয়। হয়তো তাঁর মাথার মধ্যে কোনোরকম একটু এলোমেলো হয়ে গেছে, অনেকদিন তেমন নড়াচড়া নেই কিনা। এখন বুঝতে পারলেন মিঃ আলম, মেঝেটা তাঁকে নিয়ে কোথাও সরে এসেছে। জায়গাটা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন এবং স্মরণ করে রাখার চেষ্টা করলেন।

মিঃ আলম এখানে নতুন, তাই জায়গাটা তাঁর পরিচিত নয়। যেখানে তিনি গাড়িতে উঠলেন সেটা শহরের কোন্ জায়গা বুঝতে পারলেন না।

মিঃ শঙ্কর রাও সবেমাত্র শয্যা ত্যাগ করে মেঝেতে নেমে দঁড়িয়েছেন অমনি ফোনটা বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং করে।

মিঃ রাও রিসিভারটা হাতে উঠিয়ে নেন-হ্যালো, স্পিকিং মিঃ রাও-- কে মিঃ হারুন বলছেন? কি বললেন---মিঃ আলম—আমার বন্ধু আলম-অফিসে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন? কি বলছেন আপনি! আবার কোন্ নতুন আমদানি এটা? আচ্ছা, আমি এক্ষুণি আসছি। দেখবেন পালায় না যেন!

মিঃ শঙ্কর রাও তাড়াতাড়ি কোনোরকমে নাস্তা শেষ করে গাড়ি নিয়ে ছুটলেন।

পুলিশ অফিসে পৌঁছে দেখলেন মিঃ হারুন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার উদ্বিগ্নভাবে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। অদূরে একটা চেয়ারে বসে এক ভদ্রলোক।

মিঃ হারুন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন— ওকে চিনলেন মিঃ রাও?

মিঃ শঙ্কর রাও এগিয়ে এসে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন ভদ্রলোককে, তারপর হঠাৎ অস্ফুট ধ্বনি করে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে— আপনি! এতদিন কোথায় ছিলেন মিঃ আলম?

মিঃ হারুন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— মিঃ রাও, এবার সঠিক বন্ধুকে পেয়েছেন তো?

হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিঃ হোসেন বলে উঠেন— কি আশ্চর্য, সেই মিঃ আলম আর এই মিঃ আলমে হুবহু মিল রয়েছে।

মিঃ শঙ্কর রাও বললেন—সেই কারণেই আমারও ভুল হয়ে গিয়েছিল, যে ভুলের জন্য আমি দস্যু বনহুরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলাম।

মিঃ আলম, মিঃ রাও এর বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে শান্ত গলায় বললেন— দস্যু বনহুরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা কোন কলঙ্কের বা লজ্জার কথা নয়, বরং তাকে বন্ধুরূপে পাওয়া পরম ভাগ্য।

পুলিশ অফিসের সকলে অবাক হয়ে তাকান মিঃ আলমের মুখের দিকে। মিঃ শঙ্কর রাও বললেন— আপনি দেখছি দস্যু বনহুরের খুব ভক্ত হয়ে গেছেন। যাক বলুন, আসল ব্যাপারটা কি?

মিঃ আলম বললেন— আপনি বসুন, আমি সমস্ত ঘটনাটা বলছি।

মিঃ শঙ্কর রাও আসন গ্রহণ করেন।

মিঃ আলম এবার ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা বলে যান। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সকলে শুনছেন তাঁর কথাগুলো। এতদিন সত্যিকারের মিঃ আলম

দস্যু বনহুরের পাতালপুরী আস্তানার গোপন কক্ষে বন্দী ছিলেন জেনে পুলিশ অফিসারগণ হতবাক হয়ে যান। এতক্ষণে তাদের মনের সন্দেহ দূর হল।

মিঃ আলম বললেন—দস্যু বনহুরের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তা সত্যি প্রশংসনীয়। আমি আশ্চর্য হয়েছি, আজ একটা বছর সে আমাকে তার গোপন কক্ষে বন্দী করে রেখেছিল বটে, কিন্তু আমাকে সে এতটুকু কষ্ট দেয়নি। আমার যখন যা প্রয়োজন তা পেয়েছি। এমন কি বাইরের খবরাখবর যাতে জানতে পারি সেজন্য দৈনিক পত্রিকায় ব্যবস্থাও ছিল সেখানে।

হেসে বললেন মিঃ হারুন— দস্যু বনহুর দেখছি আপনাকে জামাই আদরে রেখেছিলো?

হ্যাঁ, তার চেয়েও বেশি।

হেসে বলেন শঙ্কর রাও— কিন্তু দস্যু বনহুর আপনার সঙ্গে যতই সৎ এবং মহৎ ব্যবহার করুক তাকে আমরা গ্রেফতার করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমরা পুলিশবাহিনী সম্পূর্ণ একমত— বললেন মিঃ হারুন।

* * *

মিঃ আলমকে দস্যু বনহুর বন্দী করে রেখেছিল—কথাটা মিঃ জাফরীর কানে যেতে তিনি সিংহের ন্যায় গর্জে উঠলেন। দু'চোখে তাঁর আগুন ঠিকরে বের হলো, তিনি পুলিশবাহিনীর ওপর কড়া হুকুম দিলেন—যে কোনোভাবেই হউক দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতেই হবে। একজন সুদক্ষ গোয়েন্দাকে সে এভাবে আটক করে রেখে গোয়েন্দা বিভাগকে অপদস্ত করেছে।

মিঃ জাফরীর কঠিন আদেশে আবার পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেল। এবার পুলিশবাহিনী দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য উঠেপড়ে লাগলো।

পথে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্র পুলিশ গোপনে অনুসন্ধান চালালো। গোয়েন্দা বিভাগের লোক ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পুলিশ অফিসারগণ ছুটাছুটি শুরু করলেন।

মিঃ জাফরী ভেবেছিলেন দস্যু বনহুরের আস্তানা বিনষ্ট করে দিয়ে তার বিশেষ ক্ষতি করেছেন। আর সে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। এবার সে এদেশ ত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

মিঃ জাফরী সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে গহন বনে যেখানে দস্যু বনহুরের আস্তানা ছিল সেই জায়গায় অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন।

মিঃ জাফরীর দলবলের হাতে অনেক বন্য পশু নিহত হলো। অনেক আহত হয়ে আত্মগোপন করলো বনের মধ্যে। গোটা বন চষে ফিরলো পুলিশবাহিনী। এমন কি তারা রাতেও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দস্যু বনহুরের সন্ধান করতে লাগলো।

পুলিশবাহিনীর মশালের আলোতে গোটা বনভূমি আলোকিত হয়ে উঠলো। বন্য জীবজন্তু সব ছুটে পালাতে লাগলো এদিকে ওদিকে। গাছের পাখি সব নীড় ছেড়ে আকাশে উড়ে উঠলো। সে এক মহা হুলস্থূল কাণ্ড।

দস্যু বনহুর তার পাতালপুরীর গোপন আস্তানায় একটা কক্ষে পায়চারী করছে।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ালো।

বনহুর পায়চারী বন্ধ করে তাকায় রহমানের মুখের দিকে, গম্ভীর কণ্ঠে বলে সে—কি খবর রহমান?

সর্দার, ওরা এখনও বনে বনে অনুসন্ধান চালিয়ে চলেছে।

হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে দস্যু বনহুর—হাঃ হাঃ হাঃ...হাঃ হাঃ হাঃ—তারপর হাসি থামিয়ে বলে— পুলিশবাহিনী দস্যু বনহুরের সন্ধানে আজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে—কিন্তু জানে না তারা, দস্যু বনহুরকে খুঁজে বের করা তাদের অসাধ্য। রহমান, আমার অসুস্থ অনুচরগণ কি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে?

তিনজন ছাড়া আর সবাই সম্পূর্ণ সুস্থ সর্দার।

যাও, সবাইকে আসতে বল।

রহমান বেরিয়ে যায়।

দস্যু বনহুর সামনের টেবিল থেকে রিভলভারখানা হাতে তুলে নিয়ে ফিরে দাঁড়াইতেই দেখতে পায় নূরী দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বনহুর প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকায় তার মুখের দিকে।

এগিয়ে আসে নূরী, মুখমণ্ডল তার বিষণ্ন মলিন। বনহুরের সামনে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু মুখ তুলে চাইতে পারে না।

বনহুর নূরীর মুখখানা তুলে ধরে মৃদু হেসে বলে— কি হয়েছে নূরী?

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে যায় নূরী, তারপর বলে— কিছু না।

বনহুর আরও ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়— নূরী, তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ।

এবার মুখ তুলে তাকায় নূরী, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে— আমি নই—তুমি হুর, তুমি একি হলে!

নূরী!

হ্যাঁ, আজ কতদিন হলো আমি লক্ষ্য করছি, তুমি সব সময় আমাকে যেন এড়িয়ে চলতে চাও। জানি না কি হয়েছে তোমার।

বনহুর আনমনা হয়ে যায়, নূরীকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করে, তারপর বলে— নূরী, একটা কথা তোমাকে বলবো?

নূরী বনহুরের চোখে চোখ রেখে বুঝতে চেষ্টা করে কি বলতে চায় সে। ভয় হয়, এমন কোনো কথা তাকে শুনতে না হয় যা তার জীবনটাকে

এলোমেলো করে দেয়। ব্যথাভরা গলায় বলে নূরী—হুর, যে কথা আমি সহ্য করতে পারবো না, তেমন কথা তুমি যেন আমাকে বলনা! বল না হুর! আমি তোমার বিরহ সইতে পারবো না।

নূরী, না বলে যে উপায় নেই!

আজ নয় হুর, পরে বল—থাক।

নূরী।

না না,আমি কোনো কথাই শুনতে চাই না..........ছুটে চলে যায় নূরী।

বনহুর নূরীর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নূরীকে বনহুর ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে, একসঙ্গে খেলা করেছে ওরা দুজন। বনে বনে ঘুরে বেড়ানো, তীর-ধনুক নিয়ে বন্য পশু শিকার করা, নদীতে সাঁতার কাটা, গাছের আড়ালে লুকোচুরি খেলা, ঘোড়ার চড়া —সব একসঙ্গে করেছে ওরা। সব সময় বনহুর নূরীকে তার ছায়ার মতই পাশে পাশে দেখেছে— আজ সেই নূরী কি করে দূরে সরে যাবে ,কি করে নূরী তাকে ভুলবে----

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে, রহমান এসে দাঁড়ায় তার সামনে— সর্দার, সমস্ত অনুচর দরবারকক্ষে এসে গেছে।

সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর— চলো।

বেরিয়ে যায় বনহুর। তাকে অনুসরণ করে রহমান।

দরবারকক্ষ।

বনহুর তার সুউচ্চ আসনে পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। অন্যান্য অনুচর দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই প্রতীক্ষা করছে সর্দারের আদেশের।

বনহুর তার অনুচরগণের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে তোমরা জানো, পুলিশবাহিনী আমার সন্ধানে ছুটাছুটি করছে। কিন্তু তারা কোনদিনই দস্যু বনহুরের সন্ধান পাবে না। আমার পাতালপুরীর এই আস্তানা কেউ কোনরকমে খুঁজে পাবে না। আমি আমার কাজ এখান থেকেই চালাবো। রহমান আজ তোমরা প্রস্তুত থেক আমি চাঁদপুরের জমিদার-বাড়িতে হানা দেব।

রহমান বিনীত কণ্ঠে বলে—সর্দার চারদিকে পুলিশ তন্নতন্ন করে সন্ধান চালাচ্ছে, এই অবস্থায় ..

গর্জে ওঠে দস্যু বনহুর—সাধ্য কি পুলিশ দস্যু বনহুরের কাজে বাধা দেয়। রহমান, জানো না চাঁদপুরের জমিদার কত ভয়ঙ্কর, কত পাষণ্ড! প্রজাদের

ওপর সে যে অনাচার চালিয়েছে তা অতি জঘন্য। আজ পর পর তিন বছর চাঁদপুরের মাটিতে ফসল জন্মেনি। সেখানে লোকজন না খেয়ে অনাহারে শুকিয়ে মরছে। এমন কি ক্ষুধার জ্বালায় তারা আত্মহত্যা করছে। কিন্তু নির্মম জমিদারের কোনদিকে লক্ষ্য নেই। সে প্রজাদের গায়ের রক্ত চুষে নিঙড়ে খাজনা আদায় করে নিচ্ছে।

রহমান বলে ওঠে—সর্দার, শুধু তাই নয়, যারা কর দিতে না পারছে , চাঁদপুরের জমিদার সুলতান হোসেন তাদের স্ত্রী ও যুবতী কন্যাকে কেড়ে নিয়ে আসছে। কত লোক ভয়ে মাতাল জমিদারের হাতে স্ত্রী-কন্যাকে সমর্পণ করে দায়মুক্ত হচ্ছে।

এ কথা এতদিন আমাকে জানাওনি কেন রহমান। বনহুরের দু'চোখে যেন সহসা ধক করে জ্বলে ওঠে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে— সুলতান হোসেনের এই জঘন্য আচরণ সহ্য করা যায় না। তাকে উচিত শাস্তি দেব রহমান, কোন বাধাই আমি মানতে রাজী নই। যাও, তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও।

বনহুর দরবারকক্ষ থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

রহমান অনুচরগণকে বললো— তোমরা সব সময় তৈরি থেক, সর্দারের হুকুম হলেই ছুটতে হবে।

আমরা সবাই প্রস্তুত।

রহমান ও দলবল দরবারকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে।

অন্যান্য অনুচর চলে যেতেই সামনে এসে দাঁড়ায় নূরী, রহমানকে লক্ষ্য করে বলে— রহমান, হুর আবার কোথায় যাবার জন্য তোমাদের তৈরি হবার নির্দেশ দিল?

চাঁদুপুর।

সেখানে কেন?

তাঁর যা কাজ, সেই কাজের জন্য।

পুলিশবাহিনী হুরের সন্ধানে গোটা দেশ চষে ফিরছে, এমনকি..

আজ তো নতুন নয় নূরী। সর্দারকে তুমি ভালভাবেই জানো। কোন বাধাই তাকে ক্ষান্ত করতে পারবে না।

জানি, তবু তাকে যেমন করে হউক রুখতে হবেই।

সশস্ত্র পুলিশবাহিনী, তাদের হাতের উদ্যত রাইফেল কোনোটাই সর্দারকে রুখতে সক্ষম হবে না নূরী।

আমি তাকে রুখবো, কিছুতেই আমি এসময় তাকে চাঁদপুর যেতে দেব না।

বেশ, চেষ্টা করে দেখ যদি সক্ষম হও। কিন্তু মনে রেখ নূরী, চাঁদপুরের লোকজন আজ যে অবস্থায় রয়েছে তাতে সর্দারকে কিছুতেই তুমি ধরে রাখতে পারবে না।

আচ্ছা, আমি দেখবো। নূরী চলে গেল সেখান থেকে।

রহমান হাসলো। তার হাসির মধ্যে ফুটে উঠলো একটা ব্যথার আভাস। মনে মনে বলল সে—নূরী, যার জন্য তুমি উদগ্রীব, সে কি তোমার জন্য এতটুকু ভাবে— কেন তুমি আলেয়ার আলোর পেছনে ছুটছো।

◆

বিয়ের আসর থেকে মনিরা নিখোঁজ হওয়ায় মনিরার বড় চাচা আসগর আলী সাহেব বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর সমস্ত আশাভরসা পণ্ড হয়ে গেল। এত ধন-সম্পদ হাতে পেয়েও পেলেন না। মনিরাকে কোনোরকমে পুত্রবধূ করে নিতে পারলেই তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হত। ছোট ভাইয়ের বিপুল ঐশ্বর্য তাঁর হাতে চলে আসতো।

ক্ষোভে-দুঃখে মরিয়া হয়ে উঠলেন আসগর আলী। তাঁর বুঝার কিছুই বাকী রইলো না, নিশ্চয়ই সেই দস্যু বদমাইশটা মনিরাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। তাঁর সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড করে দিয়েছে। অধর দংশন করতে লাগলেন আসগর আলী। যত রাগ হলো মনিরার মামীমার উপর। এত সাহস দস্যুটার যে, মনিরাকে বিয়ের আসর থেকে চুরি করে নিয়ে গেল!

আসগর আলী শহরে গিয়ে থানায় ডায়েরী করলেন। দস্যু বনহুর তাঁর ভাতিজীকে চুরি করে নিয়ে গেছে এবং এই চুরির ব্যাপারে চৌধুরী গৃহিণী মরিয়মের গোপন ইংগিত রয়েছে। মনিরা তার ভাতিজী, কাজেই মনিরার ওপর তার মামা-মামীমার চেয়ে তাঁর অধিকার অনেক বেশি।

পুলিশমহল তো আগে থেকেই দস্যু বনহুর এবং চৌধুরী পরিবারের উপর ভীষণ খাপ্পা ছিলেন, আসগর আলীর কেস তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহে গ্রহণ করলেন।

দু'দিন পর আসগর আলী পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনকে নিয়ে হাজির হলেন চৌধুরী বাড়িতে।

বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে।

সরকার সাহেব বাইরে যাওয়ার জন্য গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় আসগর আলী ও ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন হাজির হলেন সেখানে।

সরকার সাহেব অবাক চোখে তাকালেন ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের মুখের দিকে। যদিও তিনি আসগর আলীকে তাঁর সঙ্গে দেখে অনুমানে সব বুঝে নিয়েছিলেন, তবু না বুঝার ভান করে বললেন–ইন্সপেক্টার সাহেব যে! ব্যাপার কি?

মিঃ হারুন কোন কথা বলার পূর্বে বলে ওঠেন আসগর আলী–ব্যাপার একটু পরেই জানতে পারবেন। এখন বলুন আমার ভাতিজী মনিরা কোথায়?

মিঃ হারুন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–চৌধুরী সাহেবের ছেলে দস্যু বনহুর তাকে চুরি করে এখানে এনেছে।

একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন সরকার সাহেব–একথা আপনারা কোথায় শুনলেন? গত পরশু মনিরাকে আসগর আলী সাহেব জোরপূর্বক নিয়ে গেছেন, তারপর আর তার কোনো খোঁজখবর আমরা জানি না। যদিও সরকার সাহেবের মিথ্যা বলতে বাধছিল তবু না বলে উপায় ছিল না।

আসগর আলী বললেন–নিশ্চয়ই মনিরা এখানে আছে। ইন্সপেক্টার, আপনি তল্লাশি নিন।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব প্রমাদ গুণলেন, এখন উপায়! মনিরা এখন নিজের ঘরে বসে আছে। এখনই তিনি ধরা পড়ে যাবেন ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের কাছে।

এখানে যখন সরকার সাহেব, আসগর আলী ও মিঃ হারুনের মধ্যে কথা হচ্ছিল তখন মরিয়ম বেগম হলঘর থেকে সব শুনতে পান। তিনি মুহূর্ত বিলম্ব না করে মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে সব খুলে বললেন। একটুও দেরী হলে আবার তাকে তার বড় চাচা ধরে নিয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মামীমার কথায় চমকে উঠলো মনিরা, আতঙ্কে শিউরে উঠলো সে। তাহলে উপায়! পুলিশ ইন্সপেক্টারের চেয়ে বড় চাচাকে তার বেশি ভয়। কোন বাধাই আজ তাকে রুখতে পারবে না। বড় চাচা তাকে পুলিশের সাহায্যে ধরে নিয়ে যাবেন। বেশিক্ষণ চিন্তা করার সময় তার নেই। মামীমার হাত

চেপে ধরে বলে ওঠে মনিরা—মামীমা, তুমি কিছুতেই বলবে না যে, আমি এসেছি।

মিথ্যা কথা আমি বলতে পারবো?

পারতেই হবে, একজনের ভালো করতে গিয়ে মিথ্যা বলতে দোষ নেই। যদি আমাকে পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করে থাক তবে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বলবে আমি এখানে আসিনি। তোমরা কেউ জানো না আমার সন্ধান, কথা শেষ করে দ্রুত বেরিয়ে যায় মনিরা।

মরিয়ম বেগম ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন।

একটু পরেই সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ হয়! মরিয়ম বেগম নিজকে কঠিন করে নেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে সরকার সাহেব, আসগর আলী ও পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন এসে দাঁড়ান তাঁর সামনে!

আসগর আলীর দু'চোখে যেন আগুন ঝরে পড়েছে। গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললেন– মনিরা কোথায়?

মরিয়ম বেগম দৃঢ়কণ্ঠে বলেন– জানি না।

মিঃ হারুন বললেন– মনিরাকে আপনার ছেলে দস্যু বনহুর ওর চাচার বাড়ি থেকে চুরি করে এনেছে। কোথায় সে বলুন।

বললাম তো জানি না।

মিঃ হারুন বললেন– আপনার বাড়ি খুঁজে দেখতে চাই।

দেখুন। গম্ভীর গলায় বললেন মরিয়ম বেগম।

সরকার সাহেব ঢোক গিললেন।

আসগর আলী সাহেব, মিঃ হারুন ও কয়েকজন পুলিশ গোটা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজা শুরু করলেন।

ওদিকে মনিরা ততক্ষণে ঝি দুখিনার কাপড় পরে নিয়ে কলতলায় এঁটো থালা বাসন পরিষ্কার করতে বসে গেছে। দুখিনা কল থেকে পানি তুলছে।

দুখিনার বেশে মনিরাকে চিনার কোন উপায় ছিল না! ছাই-কালি দিয়ে তার হাত দু'খানা অপরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। চুলগুলো এলোমেলো, পরনে অপরিষ্কার অল্পদামী কাপড়।

আসগর আলী, মিঃ হারুন ও পুলিশরা মনিরাকে খুজে ফিরতে লাগলো। না, কোথাও মনিরা নেই।

মিঃ হারুন নিজে মনিরার পাশে দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করলেন।

ভয়ে শিউরে উঠলো মনিরা। মনে মনে খোদার নাম স্মরণ করতে লাগলো। খোদার মহিমা অপার! কেউ দুখিনার বেশে মনিরাকে চিনতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে আসগর আলী ও পুলিশের দল বিদায় নিল।

আসগর আলী মনে মনে ভাবলেন, বনহুর মনিরাকে চুরি করে কোন গহন বনে লুকিয়ে পড়েছে। বিদায়কালে আবার আসব বলে মরিয়ম বেগমকে জানিয়ে গেলেন আসগর আলী।

আসগর আলী দলবল নিলে চলে যেতেই মরিয়ম বেগম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, মনিরা তাহলে গেল কোথায়। দিনের আলোতে কোথায়ই বা লুকালো সে। মনিরার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি।

সরকার সাহেবও ব্যস্ত হয়ে এ বাড়ি ও-বাড়ি সন্ধান নিতে শুরু করলেন।

মনিরা নিজেদের বাড়ির মধ্যেই দিব্যি আরামে সকলের চোখের সামনে রয়েছে, এটা কেউ জানতে পারেনি।

গোটা দিন চলে গেল।

মরিয়ম বেগমের মনে অশান্তির কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো। সরকার সাহেব ও বাড়ির সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

মনিরা দুখিনার ছদ্মবেশে থেকে মামীমার ব্যস্ততা লক্ষ্য করলো কিন্তু চট্ করে নিজেকে প্রকাশ করলো না। ভয় হলো, আবার যদি তার শয়তান বড় চাচা এসে হানা দেয়। তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কাজেই আত্মগোপন করে মনিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

একমাত্র দুখিনা জানতো আর জানতো নকীব। মনিরা ঝি-এর বেশে রান্নাঘরের মধ্যে নিজেকে গোপন রাখলেও এদের দু'জনের সাহায্য তার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল।

মনিরা ইচ্ছা করেই সরকার সাহেব ও মামীমাকে নিজের গোপনতা জানালো না। হঠাৎ যদি তাঁরা স্নেহ বশীভূত হয়ে তাকে আদর করে বসেন, বা স্নেহ দেখান তাহলেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে পড়তে পারে। বড় চাচা এলে তখন নিজকে গোপন রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। অন্ততঃপক্ষে দুটো দিন তাকে কষ্ট করতেই হবে।

এদিকে মরিয়ম বেগম ও সরকার সাহেব মনিরার জন্য অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। মরিয়ম বেগম কাঁন্নাকাটি শুরু করে দিলেন।

□

চাঁদপুর জমিদার বাড়ি।

কাচারী ঘরে বসে তামাক টানছে জমিদার সুলতান হোসেন। বয়স তার পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথার চুলে পাক ধরলেও স্বাস্থ্যের কোন অবনতি ঘটেনি এখনও। বলিষ্ঠ চেহারা, উজ্জ্বল গৌর গায়ের রঙ। চেহারায় সুস্পষ্ট আভিজাত্যের ছাপ। প্রথম দর্শনেই তাকে জমিদার বলে চিনতে ভুল হয় না কারও।

সুলতান হোসেন তাকিয়ায় ঠেক দিয়ে বসেছিল, সামনে এক বৃদ্ধ চাষী দাঁড়িয়ে! মলিন জীর্ণ তালিকাযুক্ত লুঙ্গি আর একটা ছেঁড়া জামা তার শরীরে। কাঁধে মলিন ছেঁড়া গামছা। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে সে। একপাশে দণ্ডায়মান দারোয়ান। সুপক্ক তেল-চকচকে লাঠি তার হাতের মুঠায় ধরা রয়েছে।

জমিদারের কয়েকজন পরিষদ বসে রয়েছে একপাশে।

সুলতান হোসেন গর্জন করে ওঠে—বেটা খাজনা দিতে পারো না, এবার সব নিলাম করে নেব।

বৃদ্ধ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল– ঐ সামান্য ভিটেটুকু কেড়ে নিলে আমায় পথে দাঁড়াতে হবে, হুজুর আপনি গরীবের মা– বাপ, আমাকে দয়া করুন হুজুর! আমার মেয়েটাকে আপনি পথে বের করবেন না.........

কোন কথা আমি শুনবো না। আর দু'দিন সময় দিলাম– যাও, যাও এখান থেকে। সুলতান হোসেন গম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠলো।

বৃদ্ধ কিছু বলতে যাচ্ছিলো, দারোয়ান গলাধাক্কা দিয়ে তাকে বের করে নিয়ে যায়।

সুলতান হোসেন তার একটা অনুচরের দিকে তাকিয়ে কিছু ইংগিত করে।

পরিষদের দল থেকে একজন অনুচর উঠে বেরিয়ে যায়।

দারোয়ান তখন বৃদ্ধের পিঠে লাঠির গুঁতো দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

সুলতান হোসেনের অনুচরটা দারোয়ানের কাঁধে হাত রেখে ফিস্ ফিস্ করে কিছু বলল।

দারোয়ান একটু হেসে বৃদ্ধকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

অনুচরটা এবার বৃদ্ধ চাষীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে চাপা কণ্ঠে- বললো-বেটা, ঘরে জোয়ান মেয়ে থাকতে এত ভুগছিস কেন, এক পয়সা লাগবে না যদি......

বৃদ্ধের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো। গরীব সে হতে পারে কিন্তু পশু নয়। এটুকু বুঝার মত বুদ্ধি তার আছে, মেয়েকে সে কিছুতেই লম্পট জমিদারের হাতে তুলে দিয়ে দায়মুক্ত হতে পারে না। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে সে- ভিটে নিলাম হয়ে যাক, পথে পথে ঘুরে বেড়াব সেও ভালো, তবু তোমাদের দয়া আমি চাই না।

বৃদ্ধের কথায় রাগে, অপমানে সুলতান হোসনের অনুচরটা গর্জে উঠলো আচ্ছা, দেখা যাবে।

সব কথা এসে বলল সে সুলতান হোসেনের কাছে।

সুলতান হোসেন হাসলো।

ঐদিন রাত্রে বৃদ্ধ চাষী যখন ঘুমে, তখন তাকে মজবুত করে হাত-পা-মুখ বেঁধে তার মেয়েটাকে তুলে নিয়ে আসা হলো।

কে কোথায় তার মেয়েকে নিয়ে গেল, পাড়া প্রতিবেশীরা কেউ জানলো না।

পরদিন বৃদ্ধ জমিদারের দরবারে হাজির হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো বললো— হুজুর, কাল রাতে আমার মেয়েকে কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। আপনি আমার মা-বাপ, আমাকে বাঁচান, বাঁচান হুজুর। আমার ঐ একটি মাত্র মেয়েটাকে খুঁজে বের করে দিন হুজুর।

কর্কশ কণ্ঠে গর্জে ওঠে সুলতান হোসেন— এখান থেকে বেরিয়ে যা হতভাগা। নেকামি করার জায়গা পাওনি। কে না কে তোর মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেছে ঠিক নেই, আমি কোথায় খুঁজতে যাব? দরোয়ানকে ইংগিত করলো ওকে বের করে দিতে।

দারোয়ান গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় চাষীকে।

বৃদ্ধ চাষী হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়। কপালে করাঘাত করে বিলাপ করতে থাকে।

সুলতান হোসেন এমনি করে দিনের পর দিন চালায় প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার। কারও মেয়ে, কারও বউ ছিনিয়ে নিয়ে আসে সে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

নির্মম জমিদারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে কেউ বা ফিরে যায় পিতামাতা কাউকে আশ্রয় দেয়, কাউকে দেয় না। তখন সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, ভিক্ষে করে জীবন বাঁচায়, সমাজে তার কোন স্থান হয় না। আর কেউ বা কলঙ্কিত মুখ নিয়ে আর ফিরে যায় না। পুকুরের পানিতে কিংবা বিষ খেয়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে স্বামী, পিতা-মাতাকে রেহাই দিয়ে চলে যায়।

এমনি করে সুলতান হোসেন তার কুকর্ম সমাধা করে চলে।

□

সেদিন বাগানবাড়ির একটা কক্ষে সুলতান হোসেন তার নতুন আমদানি করা একটা যুবতীকে নিয়ে আমোদ-প্রমোদে মেতে উঠেছিল। যুবতী তারই একজন গরীব প্রজা গৃহলক্ষ্মী স্ত্রী।

কিছু টাকার বিনিময়ে সুলতান হোসেন যুবতী বধুটাকে তার স্বামীর নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

স্ত্রীকে দুষ্ট জমিদারের হাতে তুলে দিয়ে তার স্বামী পথের ধারে মাথা ঠুকে কাঁদছিল। স্ত্রী ছাড়া বেচারার এ দুনিয়ায় কেউ ছিল না, বড় ভালবাসতো সে স্ত্রীকে। সেই স্ত্রীকে আজ কত কষ্টে, কত যন্ত্রণায় পড়ে জমিদারের হাতে এনে দিয়েছে— কে তার দুঃখ বুঝবে।

রাত বেড়ে আসে।

ঝিমিয়ে পড়ে বসুন্ধরা।

সুলতান হোসেনের বাগানবাড়িতে তখন একটা যুবতীর ওপর চলেছে অকথ্য নির্যাতন। কিছুতেই সুলতান হোসেন মেয়েটাকে বাগে আনতে পারছে না।

জমিদার সুলতান হোসেন যখন যুবতীটাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছে, ঠিক তখন দস্যু বনহুর দলবল নিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে। প্রতিটি দস্যুর হাতে উদ্যত রাইফেল, শরীরে কালো ড্রেস। গালে গালপাট্টা বাধা। সকলের আগে রয়েছে দস্যু বনহুর, তার হাতে রিভলবার।

গাঢ় অন্ধকারে বাগানবাড়ির নিকটে এসে ছড়িয়ে পড়লো বনহুরের অনুচরগণ। সবাই প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো— দস্যু বনহুর যখন আদেশ করবে তখন সবাই একসঙ্গে আক্রমণ চালাবে।

দস্যু বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো। দেয়াল টপকে বাগানবাড়িতে প্রবেশ করে গোপনে এগিয়ে চললো সামনের দিকে।

গাঢ় অন্ধকারে দস্যু বনহুরের কালো পোশাক মিশে গেল। অনেকগুলো পাহারাদার বাগানবাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছিল। একটা শিকারী কুকুর ছেড়ে রাখা হয়েছে, যেন কোন বিপদের আশংকা না থাকে।

নিশ্চিন্ত মনে শয়তান জমিদার তার কুকর্ম সিদ্ধ করে চলেছে। এমন করেই সে দিনের পর দিন তার মনোবাসনা চরিতার্থ করে চলে। বিশ্বস্ত অনুচর আর দুর্দান্ত এলসেসিয়ান কুকুর থাকতে কোন ভয় নেই তার।

অবশ্য এত সাবধানতার প্রয়োজন পূর্বে তার ছিল না। সে জানতো, তার চেয়ে শক্তিশালী এ দুনিয়ায় আর বুঝি কেউ নেই। প্রজারা সবাই তাকে ভয় করে। তার বিরুদ্ধে টু শব্দ করবে, এমন কেউ নেই। কাজেই সে যা খুশি তাই করে যেত।

কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। প্রজারা তার এই জঘন্য আচরণ নীরবে সহ্য করে গেলেও ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে উঠেছিল। একদিন সবাই জোট পাকিয়ে আক্রমণ করেছিল জমিদারের বাগানবাড়ি।

শেষ পর্যন্ত জমিদারের পাহারাদার আর অনুচরদের হাতে জীবন দিয়েছিল তারা। নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিল তাদের। যে দু'একজন জীবন নিয়ে পালিয়েছিল তাদেরও পরে ধরে এনে হত্যা করেছিল শয়তান সুলতান হোসেন।

তারপর থেকেই জমিদার তার বাড়ি এবং বাগানবাড়িতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছিল। একটা দুর্বলতা যে সুলতান হোসেনের মনে ছিল না তা নয়, ভয় ছিল, হঠাৎ যদি আবার কোন হামলা হয়ে বসে। অবশ্য এমন একটা ভয় সমস্ত দুষ্ট লোকের মনেই লুকিয়ে থাকে। তারা প্রকাশ্যে যত আস্ফালনই করুক না কেন, একটা গোপন ভয় তাদের মনে সর্বদা দানা বেঁধে থাকে।

সুলতান হোসেন তাই এত পাহারার ব্যবস্থা করেও একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। মানুষকে তার বিশ্বাস হত না, তাই সে একটা ভয়ঙ্কর কুকুরের আমদানি করেছিল। কুকুরটা যেমন ছিল ভয়ঙ্কর তেমনি ছিল শক্তিশালী। গোটা দিন তাকে আটক করে রাখা হত অন্ধকার এক ঘরে। তাজা কাঁচা মাংস খেতে দেওয়া হত। আর রাতে ছেড়ে দেয়া হত বাগানবাড়ির মধ্যে। কোন লোক দেখলে যাতে তাকে খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে হত্যা করে, এটাই ছিল শয়তান জমিদারের উদ্দেশ্য।

দস্যু বনহুরও এই কুকুরের কবল থেকে রক্ষা পেল না। লোকচক্ষু তাকে দেখতে না পারলেও পশুর চক্ষু তাকে ধরে ফেললো, গর্জন করে এগিয়ে এলো তীরবেগে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে কোমরের বেল্ট থেকে ছোরাখানা খুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

অন্ধকারে হুংকার ছেড়ে এগিয়ে আসছে কুকুরটা। আগুনের ভাটার মত জ্বলছে ওর চোখ দুটো। ঠিক যেন দুটো টর্চলাইট একসঙ্গে আসছে।

বনহুর প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

কুকুরটা ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ছোরাটা বসিয়ে দিল কুকুরটার বুকে। অমনি ভীষণ একটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো কুকুরটা।

একটা ঘড় ঘড় শব্দ বের হলো কুকুরটার গলা থেকে, তারপর সব নিস্তব্ধ

শয়তান সুলতান হোসেন তখন উন্মত্তের ন্যায় যুবতীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে।

পাহারদারগণ লাঠি-শরকি নিয়ে ছুটে এলো।

বনহুর ইংগিতসূচক শব্দ করতেই তার অনুচরগণ আক্রমণ করলো পাহারাদারগণকে।

দস্যু বনহুর বাগানবাড়ির যে কক্ষে সুলতান হোসেন যুবতীর উপর নির্যাতন চালিয়ে চলেছিল, সেই কক্ষের কাঁচের শার্সী ভেংগে ভেতরে প্রবেশ করলো।

মুহূর্তে যুবতীকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সুলতান হোসেন। দস্যু বনহুরের অদ্ভুত কালো ড্রেস দেখেই তার দু' চোখ ছানাবড়া হল। এত পাহারার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কি করে এই লোকটা তার বাগানবাড়িতে প্রবেশ করলো। মনে মনে ভীত হলেও নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল সুলতান হোসেন—কে তুমি?

দস্যু বনহুর তার বুকের কাছে রিভলবার চেপে ধরে বলল—শয়তানের দমনকারী।

বনহুরের মুখের অর্ধেকটা ঢাকা থাকায় শুধু তার চোখ দুটো আর ভ্রু দেখা যাচ্ছিল।

সুলতান হোসেন বনহুরের চোখের দিকে তাকালো। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটার মত জ্বলছে। তা দেখে সে ভয়ে দু'পা পিছিয়ে যায়, ঢোক গিলে বলে— এখানে তুমি কি করে এলে?

যেমন করে আজরাইল আসে।

হিংস্র জন্তুর কবল থেকে ছাড়া পেয়ে হরিণ-শিশু যেমন কাঁপতে থাকে, তেমনি থরথর করে কাঁপছিল যুবতী। চুলগুলো এলোমেলো, পরিধেয় বসন শিথিল হয়ে খসে পড়েছে মেঝেতে। সে এক করুণ মর্মান্তিক দৃশ্য।

যুবতী একবার শয়তান সুলতান হোসেন আর একবার বনহুরের মুখে তাকাচ্ছিল। বিবর্ণ ফ্যাকাশে তার মুখমণ্ডল।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো—আজ তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

সুলতান হোসেনের মুখ দিয়ে একটা ভয়ার্ত অস্ফুট শব্দ বের হল। হাতজোড় করে বলল—তুমি যা চাও তাই দেব, আমাকে প্রাণে মেরো না।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো দস্যু বনহুর—হাঃ হাঃ হাঃ প্রাণের মায়া বড় মায়া, তাই না? শয়তান, আমি সব শুনেছি, সব জেনেছি। তোমার হাতে কত প্রাণ অকালে বিনষ্ট হয়েছে। তার হিসেব তুমি না রাখলেও আমি রেখেছি। পাষণ্ড, জমিদার হয়ে প্রজাদের ওপর তুমি যা অকথ্য অত্যাচার করেছ তা অতি জঘন্য। কতজনকে তুমি মিথ্যা দেনার দায়ে ফকির করেছ কত জনকে উন্মাদ করে তার সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করেছ, কত অসহায় পিতার বুক থেকে কন্যা কেড়ে নিয়ে তাকে ... না না, আর নয়...

কে—কে তুমি? এসব জানলে কি করে----

পাপ কোনদিন গোপন থাকে না শয়তান।

কে তুমি?

আমি যেই হই তোমার প্রাণ নিতে এসেছি। আমার হাত থেকে তোমার রেহাই নেই শয়তান--- বনহুরের রিভলবার গর্জে ওঠে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে সুলতান হোসেন। কিছুক্ষণ ছটফট করে নীরব হয়ে যায় তার দেহটা।

দস্যু বনহুর এবার ফিরে তাকায় যুবতীর দিকে। মুখের আবরণ খুলে বাম হাতে তার আঁচলখানা তুলে দেয় গায়ে।

যুবতী দু'হাতে আঁচলখানা শরীরে জড়িয়ে নিয়ে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কণ্ঠে বলে—কে আপনি, আমাকে এভাবে রক্ষা করলেন।

মৃদু হাসি ফুটে ওঠে দস্যু বনহুরের মুখে, বলে সে—আমি যেই হই, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। চলো তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি।

কিন্তু আমাকে কি আর গ্রহণ করবে?

কে?

আমার স্বামী।

নিশ্চয়ই করবে, চলো।

বনহুরের সঙ্গে যুবতী বের হয়ে আসে কক্ষ থেকে।

তখন পাহারাদারগণ দস্যু বনহুরের অনুচরদের কাছে পরাজিত হয়ে কেউ পালিয়েছে, কেউ নিহত হয়েছে। পথ একেবারে মুক্ত। দস্যু বনহুর যুবতীটাকে নিয়ে তার স্বামীর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো। দেখলো একটা যুবক পড়ে রয়েছে দরজার পাশে।

যুবতীটি আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো যুবকের বুকে।

দস্যু বনহুর হাঁটু গেড়ে বসে যুবকের হাতখানা তুলে নিল হাতে, হিমশীতল হয়ে গেছে যুবকের দেহটা। আত্মহত্যা করে স্ত্রীর বিরহ বেদনা থেকে মুক্তি পেয়েছে যুবকটা।

যুবতী বিলাপ করে ওঠে— ওগো, তুমি আমাকে একা ফেলে কোথায় গেলে। কে আমাকে দেখবে বল, কে আমাকে আশ্রয় দেবে!

সেই করুণ দৃশ্য দেখে বনহুরের দস্যুমনেও আঘাত লাগলো। যুবতীর করুণ কান্না তার চোখে পানি এনে দিল। বলল সে— বোন, তুমি কেঁদো না, আমি তোমায় দেখবো।

কৃতজ্ঞতাভরা চোখে তাকালো যুবতী বনহুরের সুন্দর দীপ্ত মুখখানার দিকে। যদিও অন্ধকার তবু ঝাপসা দেখতে পেল যে, ঐ চোখ দুটি অশ্রু ছলছল হয়ে উঠেছে।

দস্যু বনহুর পকেট থেকে একতোড়া নোট বের করে যুবতীর হাতে গুঁজে দিল, তারপর বলল— দরকার হলে আরও পাবে।

যুবতী টাকার তোড়া হাতে অশ্রুভরা চোখে তাকালো দস্যু বনহুরের মুখে, বলল—কে আপনি ,তা তো বললেন না?

দস্যু বনহুর শান্তকণ্ঠে বলল— আমি দস্যু বনহুর।

শিউরে উঠলো যুবতী। হাত থেকে নোটের তোড়াটা পড়ে গেল। অস্ফুট ভীতকণ্ঠেণ্ঠবলল— দস্যু বনহুর।

বনহুর নোটের তোড়াটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে যুবতীর দিকে বাড়িয়ে ধরলো—ভয় নেই, দস্যু হলেও সে তোমার কোন ক্ষতি করবে না। তুমি আমার বোন। আসি, খোদা হাফেজ! অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় দস্যু বনহুর।

একতোড়া নোট হাতে স্তব্ধ হয়ে মৃত স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে যুবতী।

দূরে শোনা যায় অশ্ব পদশব্দ।

সম্বিৎ ফিরে পায় যুবতী। তাড়াতাড়ি নোটের তোড়াটা কাপড়ের নিচে লুকিয়ে আঁচলে অশ্রু মুছে।

◆

শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় দস্যু বনহুর। সম্মুখে একটা রেকাবিতে আংগুর ফল সাজানো রয়েছে। আরও নানারকম ফলমূল রয়েছে আর একটা রেকাবিতে। বনহুর গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে।

এমন সময় রহমান সেখানে এসে এক পাশে দাঁড়ায়।

একটু কেশে বলে রহমান— সর্দার, চাঁদপুরে শান্তি ফিরে এসেছে।

উঃ কি বললে রহমান? সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর।

চাঁদপুরে শান্তি ফিরে এসেছে। এখন সেখানে লোকজন নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করতে পারছে। আবার চাষীগণের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, মাঠে মাঠে গান গেয়ে তারা ফসল বুনছে। স্ত্রী-কন্যা পুত্র নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাচ্ছে। চাঁদপুরের জমিদার সুলতান হোসেনের পুত্র মাসুম এখন চাঁদপুরের জমিদার হয়েছে।

ছেলেটা কেমন রহমান?

শুনলাম খুব ভাল।

হ্যাঁ সর্দার।

নতুন জমিদারের সঙ্গে মোলাকাত করতে হয় তাহলে। আচ্ছা রহমান, সেই মেয়েটার খবর কি জান?

জানি সর্দার। সে এখন তার স্বামীর ভিটিতেই সুখে বসবাস করছে। আপনার দয়ায় তার কোন অভাব নেই।

হুঁ, এটাই তো দুনিয়ার রীতি। রহমান, আমি চাঁদপুরে একবার যাব।

মাথা চুলকায় রহমান, বলে সে—কিন্তু সেখানে এখন পুলিশ যেভাবে ঘোরাফেরা করছে.. চাঁদপুরের জমিদার নিহত হবার পর গোয়েন্দা বিভাগ খুব সজাগভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে চলেছে। এখন সেখানে যাওয়া কি ঠিক হবে সর্দার?

সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না রহমান, আমি একাই যাব।

আমি সে কথা বলছি না সর্দার।

তা জানি, তুমি আমার জন্যই ভাবছ কিন্তু রহমান, তুমি তোমাদের সর্দারের জন্য সব সময় নিশ্চিন্ত থেক।

বনহুর রেকাবি থেকে এক ঝোপা আংগুর তুলে নিয়ে মুখের কাছে ধরলো।

রহমান বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

বনহুর আংগুর খেতে খেতে হাসতে লাগলো।

এমন সময় নূরী এসে বসলো তার পাশে। অভিমানের সুরে বলল—হুর, কেন হাসছো?

বনহুর আংগুরের ঝোপা থেকে একটা আংগুর ছিড়ে নিয়ে নূরীর মুখের কাছে তুলে ধরে—খাও।

না, আগে বল কেন তুমি হাসলে?

সব কথাই কি তোমার জানা উচিত নূরী?

হুর, আজও আমি তোমার মনের সন্ধান পেলাম না, এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না।

নূরী, এত অবুঝ তুমি।

আমি নই তুমি। একটা নারীর ব্যথা তুমি বুঝ না। নারীর অশ্রু তুমি এত ভালবাস?

হয়তো তাই।

আমি জানি, যে তোমাকে ভালবেসেছে সে-ই কেঁদেছে। জীবনভর কেঁদেছে। কত পাষণ্ড তুমি!

সে কি আমার অপরাধ?

হুর, তুমি কাউকেই কি ধরা দেবে না?

বড্ড ছেলেমানুষ তুমি, দস্যু বনহুরকে যে ভালবাসবে সেই ভুল করবে। দস্যু সে তো মানুষ নামে কলঙ্ক।

না না, তোমাকে আমি কোনদিন ছোট মনে করতে পারবো না। কে বলে, তুমি মানুষ নামে কলঙ্ক— তুমি ফেরেশতা।

বনহুর নূরীর অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলে ধরে। নিজের রুমালে নূরীর চোখ দুটো মুছে দিয়ে বলে—একটা কথা তোমাকে বলবো।

নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দিলে বলল—না, কোন কথা আমি শুনবো না।

তবে থাক।

আমি চাই শুধু তোমাকে। আর কিছুই চাই না।

আমাকে তুমি মাফ কর নূরী।

না না, আমি তোমার কোন কথা শুনবো না। দুনিয়া ভেসে যাক, আমি কোনদিকে তাকাবো না, শুধু তুমি আমার হবে।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে পায়চারী শুরু করে। মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে আসে। ললাটে ফুটে ওঠে গভীর চিন্তারেখা।

নূরী বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে ব্যথায় মুষড়ে পড়ে। বুঝতে পারে, বনহুরের মনে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। আজ নতুন নয়, নূরী আরও বহুদিন বনহুরের এমনি ভাব লক্ষ্য করেছে। যখনই সে বনহুরকে নিবিড়

করে পেতে চেয়েছে তখনই যে আনমনা হয়ে পড়েছে, নয় তো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার কাছ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে তখন নূরী।

আজ নূরী চলে যায় না, স্থিরকণ্ঠে বলে— হুর, আমি জানি, তুমি আমাকে গ্রহণ করতে রাজী নও; কিন্তু মনে রেখ, আমিও তোমায় ছাড়ছি না, আমাকে তোমার বিয়ে করতে হবে....

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বনহুর, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে— বিয়ে!

হ্যাঁ, চমকে উঠলে কেন? ওকি। তোমার মুখ অমন কালো হয়ে উঠলো কেন? বিয়ে তো পবিত্র বাঁধন।

বনহুরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো আর একখানা মুখ। চন্দনের তিলক আঁকা নববধুর বেশে সামনে এসে দাঁড়ালো যেন মনিরা, নূরীর রূপ মুছে গিয়ে মনিরার রূপ ধরা দিল বনহুরের চোখে।

বনহুর নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইলো নূরীর দিকে। বিয়ে—এই শব্দটাই সেদিন সে মায়ের মুখে শুনেছে। বিয়ে! দস্যুর আবার বিয়ে। নিছক একটা মিথ্যা অভিনয় হেসেছিল সেদিন বনহুর। আজ আবার নূরীর মুখে সেই 'বিয়ে' শব্দটা বনহুরকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেললো। নূরীর রূপ মুছে গিয়ে মনিরা ভেসে উঠলো তাঁর চোখে।

বনহুর দেখলো, করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে মনিরা। দু' চোখে তার অশ্রু, ব্যথার ছোঁয়া ফুটে উঠেছে চেহারায়। বনহুর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না। দু'হাত প্রসারিত করে দিল নূরীর দিকে।

নূরী চোখে অশ্রু মুখে হাসি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের বুকে।

বনহুর ওকে বিনিড়ভাবে বুকে টেনে নিল।

নূরী ভুলে গেল সমস্ত ব্যথা বেদনা । বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বলল— হুর, আমি জানি তুমি আমায় কত ভালবাস।

এমন সময়ে দরজার বাইরে পদশব্দ শোনা যায়।

পরক্ষণেই ভেসে আসে একটা কণ্ঠস্বর—সর্দার।

বনহুর নূরীকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের শয্যায় গিয়ে বসে।

নূরী বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

বনহুর বলে—এসো মাহবুব।

মাহবুব কক্ষে প্রবেশ করে। কুর্ণিশ জানিয়ে বলে সে— সর্দার, একটা দুঃসংবাদ।

দুঃসংবাদ?

হ্যাঁ সর্দার।

মাহবুব একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে— সর্দার, রাজা মোহন্ত সেনকে তার ছোট ভাই বন্দী করেছে।

এটাই কি তোমার দুঃসংবাদ? এ খবর আমি পেয়েছি।

সর্দার। আজ রাতে তাকে হত্যা করা হবে।

একথা তুমি কেমন করে জানলে?

আমাদের গুপ্তচর সন্ধান জেনে এসেছে।

ডাকো তাকে।

বেরিয়ে যাচ্ছিলো মাহবুব, বনহুর ডেকে বললো— রহমানকেও ডেকো, কথা আছে।

আচ্ছা সর্দার।

বেরিয়ে যায় মাহবুব।

বনহুরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে সে। রাজা মোহন্ত সেনকে বনহুর বহুদিন থেকেই জানে, এমন মহৎ ব্যক্তি কমই আছে— ধনী গরীব, দীন-দুঃখী তাঁর কাছে সমান। তিনি মুক্তহস্তে গরীবদের দান করেন। তাঁর অর্থে বহু অনাথ আশ্রম, অনেক দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরি হয়েছে। এখনও তাঁর অর্থে বহু দীন-দুঃখী শান্তিতে কাল কাটাচ্ছে। এমন লোকের অমঙ্গল আশংকা দস্যু বনহুরের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দস্যু বনহুর মহত্ত্বের বন্ধু ,শয়তানের আজরাইল। যেমন পাষণ্ড, তেমনি কোমল প্রাণ সে। মোহন্ত সেনের বিপদে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠলো!

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলো রহমান, মাহবুব আর সেই গুপ্তচরটা যে মোহন্ত সেনের খবরটা এনেছে। গুপ্তচরটার শরীরে দারোয়ানের ড্রেস এখনো রয়েছে।

সর্দারকে কুর্ণিশ জানিয়ে দাঁড়ালো সবাই।

বনহুর গুপ্তচরটাকে লক্ষ্য করে বললো— ভুলু সিং, মাহবুবের নিকটে যা শুনলাম সব সত্য।

হ্যাঁ সর্দার, সব সত্য।

আজ রাতে মোহন্ত সেনকে হত্যা করা হবে, এটাও সত্য?

হ্যাঁ, সত্য। আপনার কথামত আমি কাজ করেছি। সব সময় আমি রাজা যতীন্দ্র সেনের কাছে ছিলাম। মোহন্ত সেনকে বন্দী করেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তাঁকে হত্যা করে তাঁর রাজ্য আত্মসাৎ করে নেবার অভিসন্ধি এঁটেছে। তাছাড়া মোহন্ত সেনের কন্যা বাসবীকে একজন দুর্বৃত্ত মাতালের হাতে তুলে দিয়ে দায়মুক্ত হবার জোগাড় করেছে।

গম্ভীর কণ্ঠে একটা শব্দ করলো বনহুর— হুঁ!

ভুলু সিং তখনও বলে চলেছে—সর্দার, আজ রাতেই মোহন্ত সেনকে হত্যা করা হবে, সে কথাও আমি নিজ কানে শুনেছি।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বলে, রহমান তাজকে প্রস্তুত রেখ। তোমরাও প্রস্তুত থেক। মোহন্ত সেনকে উদ্ধার আর যতীন্দ্র সেনের যথাসর্বস্ব লুট ----হাঃ হাঃ হাঃ। দাঁতে দাঁত পিষে বলে সে— দস্যু বনহুর রাজাকে ফকির, ফকিরকে রাজা বানাতে পারে। খোদার নাম স্মরণ করে তোমরা তৈরি হয়ে নাও। যাও রহমান।

□

গভীর রাত।

যতীন্দ্র সেন শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। কক্ষে পায়চারী করে সে, নির্জন কক্ষে তার নিজের পদশব্দে চমকে ওঠে বারবার, থমকে দাঁড়িয়ে পেছনে তাকায়— নাঃ কই, কেউ নেই তো। গোটা মুখমণ্ডল তার ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছে। দু'চোখে হিংস্র শার্দুলের অগ্নিক্ষুধা। ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকের রক্ত শুষে নেবার জন্য উন্মত্ত সে। তার গোপন অনুচরগণ

এতক্ষণে হয়তো পাহাড়পুর দুর্গে পৌঁছে গেছে। হয়তো বা মোহন্ত সেনের বুকে ছোরা বসিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেছে। আজ হাতে সে একাই এ রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। আর কেউ তাকে কোন কাজে বাধা দেবে না। এবার তার বৃদ্ধা বৌদি আর ভাতিজী বাসবী—ওদের সরাতে আর কতক্ষণ।

পাশের ঘরে মোহন্ত সেনের নিদ্রাহীন স্ত্রী মায়াদেবী আর বাসবী ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আজ প্রায় এক মাস হয়ে চললো মোহন্ত সেনকে ফুসলিয়ে মিথ্যা কথা বলে রাজ্যের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল যতীন্দ্র সেন। তারপর যতীন্দ্র সেন একাই ফিরে এসেছিল, বৌদি আর বাসবীকে বলেছিল, দাদা তার এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে গেলেন। কয়েক দিন পর আসবেন।

কিন্তু দিনের পর দিন যেতে লাগলো। সপ্তাহ গিয়ে মাস হলো তবু ফিরে এলেন না মোহন্ত সেন। যে লোকটার পাশে মায়ারাণী কিংবা বাসবী এক মুহূর্ত না থাকলে নয়, সেই অসহায় অন্ধলোক কি করে এতদিন বাইরে কাটাচ্ছেন। মায়ারাণী আর বাসবী ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছেন। আজকাল যতীন্দ্র সেন বেশ দুর্ব্যবহার শুরু করেছে তাঁদের সঙ্গে।

মায়ারাণী আর বাসবী যতীন্দ্র সেনের কথাবার্তা ও আচরণে অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কেমন যেন হেঁয়ালিপূর্ণ কথা বলে যতীন্দ্র সেন। সন্দেহের ছোঁয়া লাগে মায়ারাণী আর বাসবীর মনে। ভাবে নিশ্চয়ই মোহন্ত সেনের কোন অমঙ্গল ঘটেছে। মায়ারাণী আর বাসবী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সব সময় কাঁদেন ওরা দু'জন। মায়ারাণী কাঁদেন সান্ত্বনা দেয় বাসবী—কেঁদোনা মা। তুমিই তো বলো, অসহায়ের সহায় একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর আমার বাবাকে রক্ষা করবেন।

মাতা-কন্যা যখন পাশের ঘরে কান্নাকাটি করছেন, ঠিক সেই সময় যতীন্দ্র সেন ঐ কক্ষে প্রবেশ করে।

চমকে ওঠেন মায়ারাণী আর বাসবী।

যতীন্দ্র সেন কর্কশ কঠিন স্বরে দাঁতে দাঁত পিষে বলে—এখনও তোমরা জেগে আছ?

মায়ারাণী যতীন্দ্র সেনের পা দু'খানা চেপে ধরেন—ঠাকুরপো, বলো—বলো ঠাকুরপো, তোমার দাদা কোথায়? তুমি তাঁকে কোথায় রেখেছ?

ব্যঙ্গাপুর্ণ হাসি হেসে বলে যতীন্দ্র সেন—অপেক্ষা কর, একটু পরই জানতে পারবে।

মায়ারাণী যতীন্দ্র সেনের কথায় আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। বলেন তিনি—তুমি না বলেছিলে, তোমার দাদা তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেছেন?

যা মনে কার তাই।

না না, তোমার কথায় আমার ভয় হচ্ছে যতীন্দ্র। তাঁর কোনো বিপদ ঘটেনি তো? মায়ারাণী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন।

বাসবী এতক্ষণ নিশ্চুপ সব শুনে যাচ্ছিল। সে উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানবতী মেয়ে। বুঝতে পারে, তার অন্ধ পিতাকে এই শয়তান কোনো ভয়ঙ্কর অবস্থায় ফেলেছে। আর কোনোদিন তার পিতাকে ফিরে পাবে কিনা, কে জানে! বাসবী নিজকে কঠিন করে নিয়ে বলে—মাগো, তুমি কেন এত বিচলিত হচ্ছো। ন্যায় কোনদিন ধ্বংস হতে পারে না—আর অন্যায় কোনদিন জয়ী হতে পারে না।

ঠিক বলেছিস মা, ঠিক বলেছিস---

মোহন্ত সেনের কণ্ঠস্বরে একসংগে কক্ষের সবাই চমকে ওঠে। ফিরে তাকায় সকলে। কক্ষের উজ্জল আলোতে তারা দেখতে পায় দরজায় দাঁড়িয়ে মোহন্ত সেন, তাঁর পেছনে উদ্যত রিভলভার হাতে একটা জমকালো মূর্তি।

আনন্দে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান মায়ারাণী ও বাসবী, এ কি তাঁরা স্বপ্ন দেখছেন না সত্য ভেবে পান না।

যতীন্দ্র সেনের দু'চোখে ভয় ও বিস্ময়। মোহন্ত সেনকে জীবিত এবং তাঁর পেছনে জমকালো মূর্তিকে লক্ষ্য করে হতচকিয়ে যায় সে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে—এ কি করে সম্ভব হলো? তার গুপ্ত অনুচর রাঘব আর নন্দীর হাত থেকে কি করে রেহাই পেয়েছে মোহন্ত সেন? সে বুঝতে পারে, জমকালো মূর্তি যেই হউক সে-ই যে মোহন্ত সেনকে উদ্ধার করে এনেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবার পালাবার পথ খুঁজে যতীন্দ্র সেন। কিন্তু জমকালো মূর্তির হাতের উদ্যত রিভলবার লক্ষ্য করে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্ধ রাজা মোহন্ত সেন দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসেন—মা বাসবী, তোরা কোথায়? কোথায় তোরা?

বাসবী পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই যে বাবা। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? বাসবী ভয়ার্ত দৃষ্টিতে একবার তাকালো দরজার মুখে দণ্ডায়মান জমকালো মূর্তিটার দিকে।

মায়ারাণীও এবার ভয়ার্তভাবে তাকালেন জমকালো মূর্তির দিকে। কম্পিত কণ্ঠে বললেন— ঐ শয়তানটাই বুঝি তোমাকে আটক করে রেখেছিল।

না না মায়া, ও শয়তান নয়, শয়তান নায়—দেবতা। আমাকে ও-ই রক্ষা করেছে, সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আমার চোখ নেই, তাই ওকে দেখতে পাচ্ছিনে, বলতো ও কেমন দেখতে? ওকে একটিবার দেখতে আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

কারও মুখে কথা নেই, মোহন্ত সেন বলেই চলেন, জানো মায়া—কে আমাকে পাহাড়পুর দুর্গে বন্দী করে রেখেছিল, জানো তোমরা? আজ কে আমাকে হত্যা করতে নিয়েছিল তাও জানো না। আমারই ছোট ভাই যতীন্দ্র। যতীন্দ্রই আমাকে হত্যার জন্য লোক নিযুক্ত করেছিল, কিন্তু ভগবান আমার সহায়, তাই বেঁচে গেছি।

যতীন্দ্র সেনের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বারবার দরজায় দণ্ডায়মান মূর্তির হাতের রিভলবারের দিকে তাকাচ্ছে, যম দূতের মতোই মনে হচ্ছে তার কাছে মূর্তিটাকে।

মায়ারাণী যতীন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন—ঠাকুরপো, এসব সত্যি?

ঢোক গিলে বলে যতীন্দ্র সেন—না না, তুমি ওসব বিশ্বাস করো না। সব মিথ্যা ...

কি বললে? ছায়ামূর্তি গর্জে উঠলো। চমকে উঠলেন মায়ারাণী, বাসবী ও যতীন্দ্র। কি গম্ভীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ গলা।

মোহন্ত সেন বলে ওঠেন—এবারের মত ওকে ক্ষমা করে দাও বন্ধু।

ক্ষম! যম কখনও ক্ষমা করে না।

যতীন্দ্র সেন এবার ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে—কে আপনি? কি দোষে আমাকে....

তোমার দোষের পুনরাবৃত্তি করতে আমি রাজী নই। বড় ভাইকে হত্যার দায়ে আমি তোমাকে হত্যা করব। জমকালো মূর্তি এগিয়ে এলো যতীন্দ্র সেনের দিকে।

দাদাকে আমি তো হত্যা করতে চাইনি?

আবার মিথ্যা কথা। শয়তান, এক্ষুণি আমি তোমার মিথ্যা বলার শাস্তি দিচ্ছি ---------গর্জে ওঠে জমকালো মূর্তির রিভলবার।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় যতীন্দ্র সেন।

মোহন্ত সেন বেদনার্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন—একি করলে বন্ধু। একি করলে...

বাসবী স্থির নয়নে তাকালো ছায়ামূর্তির মুখের দিকে। একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়লো তার দৃষ্টিতে, কোন কথা বের হলো না তার কণ্ঠ দিয়ে।

জমকালো মূর্তি শুধু একটা কথা উচ্চারণ করলো—শয়তানের সাজা দিয়েছি। তারপর বেরিয়ে গেল সে।

রিভলবারের গুলির শব্দে লোকজন ছুটে এলো, সবাই যতীন্দ্র সেনের রক্তাক্ত মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে হায় হায় করতে লাগলো। সবাই মোহন্ত সেনকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্যও হলো। একবাক্যে বলল সবাই— যতীন্দ্র সেনকে অন্ধ রাজা মোহন্ত সেনই হত্যা করেছেন।

পুলিশসহ দারোগা এলেন। লাশ এবং সমস্ত কক্ষ তল্লাশি করে দেখতে লাগলেন।

পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর মিঃ হোসেন কক্ষ তল্লাশি করার সময় হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে গেলো যতীন্দ্র সেনের লাশের পাশে রক্তের মধ্যে পড়ে রয়েছে একখানা ভাঁজকরা কাগজ।

মিঃ হোসেন কাগজখানা তুলে নিয়ে পড়ে দেখলেন— একি, এ যে দস্যু বনহুরের চিঠি!

সবাই দেখলো কাগজখানায় লেখা রয়েছে,

'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' — দস্যু বনহুর

এতক্ষণে সকলের কাছে ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল। অন্ধ রাজা মোহন্ত সেনকে প্রজাগণ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস করতো। যতীন্দ্র সেনের নিহত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে সকলের মনেই যে একটা বিস্ময়কর প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, সেটা এক্ষণে সমূলে দূরীভূত হল।

একবাক্যে বললো সবাই আমাদের রাজা কোনদিন এমন কাজ করতে পারেন না।

দস্যু বনহুরেরই এ কাজ। প্রজাগণ মুখে কিছু না বললেও মনে মনে জানে, যতীন্দ্র সেন অত্যন্ত দুষ্ট এবং কুচক্রী ছিল। দস্যু বনহুর তাকে হত্যা করে ভালোই করেছে।

মিঃ হোসেন যতীন্দ্র সেনের বাড়ি তল্লাশি করে আরও দেখলেন যতীন্দ্র সেনের লোহার সিন্দুক শূন্য পড়ে আছে। টাকা-পয়সা-অলঙ্কার সব উধাও হয়েছে। এও যে দস্যু বনহুরের কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিঃ হোসেন লাশ চালান দিয়ে নিজেও রওয়ানা হলেন। পুলিশ মহলে একেই দস্যু বনহুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার ওপর পর পর দুটি খুন— চাঁদপুরের জমিদার হত্যা আর যতীন্দ্র সেনের নিহত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে এক চঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো!

এত পাহারা, এত সাবধানতা সত্ত্বেও দস্যু বনহুর তার কাজ যথাযথ সমাধা করে চলেছে। পুলিশবাহিনী কোন সমাধানই করতে সক্ষম হচ্ছে না।

মিঃ জাফরী এবং পুলিশমহল দস্যু বনহুরের জন্য ভীষণ আশঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

পর পর দুইটি হত্যার ব্যাপারে জোর তদন্ত শুরু হল।

□

দস্যু বনহুর যতীন্দ্র সেনের সিন্দুক থেকে লুণ্ঠিত টাকা-পয়সা-অলঙ্কার নিয়ে এসে দীনহীন, গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিতে লাগলো। যাদের খাবার নেই তাদের অন্নের সংস্থান করলো। যাদের পরিধেয় বস্ত্র নেই, তাদের বস্ত্র

দিল। দস্যু বনহুর উন্মত্ত নেশায় মেতে উঠলো। ধনীদের ধনরত্ন কেড়ে নিয়ে বিলিয়ে দিতে লাগলো অনাথদের মধ্যে।

ধনীরা যেমন দস্যু বনহুরের ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠতে লাগলো, তেমনি দুঃখিগণ দস্যু বনহুরের নামে হৃদয়ে অনাবিল এক আনন্দ উপভোগ করতে লাগলো।

দস্যু বনহুর মেতে রইল তার খেয়াল নিয়ে। লুণ্ঠিত দ্রব্য দীন-দুঃখীদের বিলিয়ে যা বেচে যেত, সব ছুড়ে ফেলে দিত সে নদীর জলে।

ওদিকে চৌধুরীবাড়িতে মনিরা ঝি-এর বেশে দু'দিনের বেশি আত্মগোপন করে থাকতে পারলো না। ধরা পড়ে গেলো সে মামীমার কাছে। অতি সাবধানে নিজকে বাঁচিয়ে চলাফেরা করতে লাগলো মনিরা। বড় চাচার আশঙ্কায় সদাসর্বদা চিন্তিত থাকত। কিন্তু তার নিজের চেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন থাকতো মনিরা দস্যু বনহুরের জন্য। পত্রিকায় দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সবকিছুই জানতে পেরেছিল সে। বনহুর যে দিনের পর দিন নরহত্যা লুটতরাজ নিয়ে মেতে রয়েছে ,এ খবর সে পত্রিকা মারফতেই পেল।

দুঃখ-ব্যথায় মুষড়ে পড়লো মনিরা। সেদিনের পর থেকে প্রতিদিন প্রতীক্ষা করছিল, সে দস্যু বনহুরের— এবার নিশ্চয়ই সে সংযত হবে, সভ্য হবে সে— কিন্তু মনিরার সমস্ত আশা বাসনা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। দস্যু বনহুরের সাক্ষাৎলাভ তার ভাগ্যে জুটলো না।

সমস্ত রাত মনিরা বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। অসহ্য একটা ব্যথা তার মনকে নিষ্পেষিত করে। চোখের পানিতে বালিশ সিক্ত হয়।

একটু শব্দ হলেই চমকে উঠে ছুটে যায় জানালার পাশে, ঐ বুঝি এলো সে।

কিন্তু সব আশা বিফল হয়, শূন্য অন্ধকারে তাকিয়ে চিত্রাপিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাত ভোর হয়ে আসে, শয্যায় লুটিয়ে পড়ে মনিরা। এতদিন ওকে ভালবাসতো—সে ভালবাসা ছিল প্রাণহীন। এখন বনহুর তার স্বামী—তার সর্বস্ব।

হাহাকার করে ওঠে মনিরার হৃদয়। দিন যায়, আবার রাত আসে। রাত শেষ হয়, আবার দিন আসে। মনিরা বনহুরের প্রতীক্ষায় কেঁদে কেঁদে সারা হয়।

মরিয়ম বেগম সব বুঝেন। তিনি মনিরার হৃদয়ের ব্যথা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন—কিন্তু কি করবেন, কোনরূপ সান্ত্বনাই তিনি দিতে পারেন না মনিরাকে। স্ত্রীর স্বামীই যে সব। স্বামী ছাড়া নারী জীবন ব্যর্থ। এ কথা তাঁর নারী মনে সদা-সর্বদা জাগরিত রয়েছে।

মনিরার চোখের পানি মরিয়ম বেগমের মনের শান্তি কেড়ে নিল। পুত্রের চিন্তায় তিনি যতটুকু বিচলিত না হয়েছেন তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হলেন মনিরার জন্য।

তিনি ভেবেছিলেন, মনিরার বিয়ে হলে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন। হয়তো তাঁর মনির ভাল হবে, দস্যুতা ছেড়ে দেবে। কিন্তু সব আশা-আকাঙ্খা তাঁর সমূলে মুছে গেল বরং আর একটা চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুললো। এ তিনি কি করলেন। কেন তিনি না ভেবেচিন্তে মনিরের হাতে মনিরাকে সঁপে দিলেন। অন্য কোন সুপাত্রের কাছে মনিরার বিয়ে দিলে সুখী হত, সে সব সময় স্বামীকে পাশে পেত-এর চেয়ে আনন্দ আর কি আছে।

একদিন মনিরাকে কাছে নিয়ে বললেন মরিয়ম বেগম—মা মনিরা, একি হলো। একি করলাম আমি। ভাল ভেবে তোকে আমি ওর হাতে তুলে দিলাম, কে জানতো সে তোকে ভুলে যাবে—আমি ওকে অভিশাপ দেবো...

না না, ও কথা তুমি মুখে এনো না মামীমা। আমি সব ব্যথা সইতে পারবো কিন্তু ওর অমঙ্গল সইতে পারবো না। সইতে পারবো না মামীমা।

রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন মরিয়ম বেগম— নরাধম তোকে এমনি করে কাঁদাবে?

এ কাঁদায় তবু আনন্দ আছে মামীমা। আমি যদি সত্যিই তার স্ত্রী হয়ে থাকি, নিশ্চয়ই সে একদিন না একদিন আসবে।

মনিরার এত আশা, এত স্বপ্ন সফল হলো না। বনহুর নিজকে নিয়েই মেতে রয়েছে, কোন কথা ভাবার সময় নেই। পুলিশ বাহিনীর শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে নিজের কাজ সমাধা করে চললো সে।

মনিরা ঘরে বসে পত্রিকা পড়ে জানতে পারল সব।

একদিন রাতে মনিরা মামীমার কক্ষে গিয়ে হাজির হলো, বললো সে—মামীমা, আমাকে অনুমতি দাও। ওকে একবার দেখে আসি।

অবাক কণ্ঠে বললেন মরিয়ম বেগম—পাগলী মেয়ে—এও কি সম্ভব। যার সন্ধানে শত শত পুলিশবাহিনী অহরহ সন্ধান চালিয়েও কোন হদিস পাচ্ছে না, আর তুই তাকে খুঁজে বের করতে পারবি?

পারবো, আমি পারবো তাকে খুঁজে বের করতে। তুমি শুধু অনুমতি দাও মামীমা।

তবে সরকার সাহেবকে নিয়ে যা।

না, আমি একাই যাব।

সেকি মা!

ভয় করো না। তোমার পুত্রবধু যদি হয়ে থাকি তবে কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

◆

দীন-দুঃখী গরীবদের মধ্যে মনিরাও এসে দাঁড়ালো। শরীরে তার ছিন্ন বসন। চুলগুলো রুক্ষ, গায়ে-পায়ে ময়লা জমে রয়েছে। তাকে দেখলে কেউ চিনতেই পারবে না এই সেই মনিরা।

আজ কতদিন হলো মনিরা গৃহত্যাগ করে দস্যু বনহুরের সন্ধানে বেরিয়েছে। পথে-ঘাটে, মাঠে শহরে-গ্রামে কত জায়গাই না খুঁজেছে সে বনহুরকে। রাতের পর রাত ধনীদের বাড়ির আশে পাশে ধর্ণা দিয়েছে ,যদি সে দস্যুতা করতে আসে। গরীব-ধনী-দুঃখীদের মধ্যেও দিন কাটিয়েছে। যদি সে দান করতে আসে। আশায় আশায় পথে পথে ফিরছে মনিরা

একটিবার তার দেখা যদি পায়। কিন্তু সব আশা, সব বাসনা মুছে গেল, দেখা পেল না তার জীবন সাথীর।

সেদিন হঠাৎ শুনলো পাশের গ্রামে একটা ভোজসভা হবে। সেখানে শুধু গরীবদের খাওয়ানো হবে। খাওয়া শেষে সেখানকার জমিদারপুত্র গরীবদের মধ্যে টাকা-পয়সা দান করবেন।

আজ দু'দিন অনাহারে অনিদ্রায় মনিরা একেবারে ভেঙ্গে পড়ার মত হয়েছে? পয়সা-কড়ি যা সংগে এনেছিল সব শেষ হয়ে গেছে। কজেই মনিরার দু'দিন সম্পূর্ণ অনাহারে কাটছে। দুঃখ সইবার মত ক্ষমতা তার আছে, কিন্তু এত কষ্ট কোনদিন সে পায়নি। অনাহার কাকে বলে জানে না মনিরা। চাইবার অভ্যাস তার কোন কালেই নেই। ছোটবেলা হতেই সে রাজকন্যার মত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ হয়েছে। হঠাৎ এই অবস্থার জন্য মোটেই সে প্রস্তুত ছিল না। ভেবেছিল মনিরা, ওকে খুঁজে বের করা তার পক্ষে কঠিন হবে না এবং বেশিদিনও লাগবে না। কিন্তু সব আশা তার বিফল হয়েছে।

আজ ক'দিন ঘুরে ঘুরে মনিরা হতাশায় ভেংগে পড়লো। আর যখন তার চলার মত শক্তি নেই তখন জানতে পারলো, পাশের গ্রামে একটা ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। ক্ষুধায় এত কাতর হয়ে পড়েছিল যে কিছু ভাববার সময় তার নেই। দীন-দুঃখীদের মধ্যে সেও গিয়ে দাঁড়ালো ভোজসভায়।

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে সবাই। কেউ ভাংগা থালা, কেউ বাটি, কেউ কলার পাতা হাতে নিয়ে প্রতীক্ষা করছে খাবারের।

মনিরার থালা নেই, কলার পাতাও সে সংগ্রহ করতে পারেনি। লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে ঘোমটায় মুখ ঢেকে হাত পেতে দাঁড়ায় সে।

ওদিক থেকে দু'জন লোক খাবার দিয়ে যাচ্ছে। সবাই সারিবদ্ধভাবে খাবার নিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে একজন তাদের হাতে কিছু কিছু পয়সা তুলে দিচ্ছে।

মনিরার শুধু হাতে খাবার দিতে গিয়ে বলে ওঠে একজন—কিগো, কিসে খাবার নেবে —হাতে দেব?

মনিরা নিশ্চুপ। হাতে খাবার কি করে নেবে। তাই হাত গুটিয়ে নেয়।

লোক দুটি মনিরাকে লক্ষ্য করে বলে— ওদিকে যাও, পয়সা পাবে।

মনিরা রিক্তহস্তে অন্যদের সংগে এগিয়ে গেল।

সবাইকে পয়সা দেওয়া হচ্ছে।

মনিরাও হাত পাতলো।

সঙ্গে সঙ্গে কে একজন বললো—এ মেয়েটি খাবার পায়নি, একে খেতে দাও।

মনিরা চোখ তুলে তাকালো, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় খুব কাতর হয়ে পড়েছিল মনিরা কাজেই সে অমত করতে পারলো না।

একটা লোক মনিরাকে লক্ষ্য করে বলল—এদিকে এসো, খাবার দিচ্ছি।

মনিরা কোনরূপ দ্বিধা না করে লোকটাকে অনুসরণ করলো।

যে কক্ষে মনিরা লোকটার সঙ্গে প্রবেশ করলো সেটা একটা মাঝারি রকমের খাবার ঘর। টেবিলে নানা রকমের খাদ্যদ্রব্য থরে থরে সাজানো। মনিরা কতদিন এমন খাবার খায়নি।

লোকটার ইংগিতে মনিরা একটা টেবিলের পাশে এসে বসলো। খানসামা গোছের লোক একটা প্লেটে অনেক রকম খাবার এনে মনিরার সম্মুখে রাখলো।

লোকটা মনিরাকে বললো—খাও।

মনিরা যদিও মনে মনে অবাক না হয়ে পারলো না, তবু ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছিল বলে গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো।

খাওয়া শেষ করে মনিরা উঠে দাঁড়ালো। তাকালো কক্ষের চারদিকে। এতক্ষণে সে যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। কিন্তু একি! মনিরা চমকে উঠলো—দরজা বন্ধ কেন? আর ঐ লোকটা গেল কোথায়?

মনিরা এতক্ষণ খাবার খেয়ালে ছিল, কোনদিকে লক্ষ্য করেনি। ঘরে কাউকে না দেখে ভীত হয়ে পড়লো। হঠাৎ এমন করে এখানে আসা তার ঠিক হয়নি। এবার বুঝতে পারলো নিশ্চয়ই কোন দুষ্টলোক তাকে কায়দায় আটক করেছে। এখন উপায়?

মনিরা অস্থিরচিত্তে জোরে জোরে কক্ষের দরজায় আঘাত করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পূর্বের সুস্বাদু খাবারগুলো এখন তার কাছে বিষাক্ত বলে মনে হতে লাগলো।

অনেক চেষ্টা করেও মনিরা দরজা খুলতে সক্ষম হলো না। হতাশ মনে সে চুল ছিঁড়ে। হাতের মাংস কামড়ে রক্ত বের করে ফেললো।

হঠাৎ পেছনে পদশব্দ শুনতে পেয়ে চমকে ফিরে তাকালো।

সেই লোকটা দাঁড়িয়ে—দেখতে পেল মনিরা, যে লোকটা তাকে প্রথম খাবার দিতে বলেছিল।

মনিরা রাগত কণ্ঠে বলে ওঠে— আমাকে তোমরা আটক করেছো কেন? আমি ভিখারী মেয়ে, আমাকে ছেড়ে দাও।

লোকটা মৃদু হাসলো, বললো—তোমাকে আর যেন ভিক্ষে না করতে হয় তার ব্যবস্থা করবেন আমাদের মনিব।

কেন আমি তার দয়া নেব?

আমাদের মনিবের তোমার ওপর খুব দরদ।

মনিরা ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলো। নিশ্চয়ই কোন কুমতলব এঁটেছে এরা। বললো- তোমার মনিবের দরদ চাই না। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই।

এসো আমার সঙ্গে। লোকটা বললো।

মনিরা মনে মনে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এমন যে একটা বিপদে পড়ে যাবে ভাবতে পারেনি সে। তবু এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বিপদ আরও বাড়ানোর চেয়ে লোকটার সাথে যাওয়া ভাল মনে করলো।

সে লোকটার সঙ্গে এগুলো।

কয়েকটা কক্ষের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটা দরজা পেরিয়ে মনিরাকে সঙ্গে করে লোকটা এখন সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলো।

মূল্যবান আসবাবপত্রের কক্ষটা সুন্দর করে সাজানো। লোকটা বললো- তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমার মনিব এক্ষুণি আসবেন।

মনিরা অস্থিরকণ্ঠে বললো- না না, আমি তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে চাই না, আমি তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে চাই না, আমাকে যেতে দাও-------

মনিরার কথা শেষ হয় না, একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সে——চমকে ওঠে মনিরা, তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। চোখ তুলে তাকাতেই দু'চোখ তার ছানাবড়া হয়। একটা অর্ধবয়স্ক লোক, শরীরে তার মূল্যবান

রাজ-রাজার পোশাক, মাথার চুলে পাক ধরেছে, দুটো গোঁফ ঝুলে আছে নাকের দু'পাশে, গলায় মূল্যবান মুক্তার হার। মুখে মৃদু হাসি। মনিরার দিকে এগুচ্ছে সে। ভয়ে মনিরা পিছু হটে। ফিরে তাকায় মনিরা– পূর্বের সেই লোকটা উধাও হয়েছে। বুক ধক্ ধক্ করতে শুরু করে।

লোকটা এগিয়ে আসছে তার দিকে।

মনিরা নিরুপায়ের মত তাকায় কক্ষের চারদিকে। এতটুকু ভরসা সে পায় না নিজকে রক্ষা করার। মনে মনে খোদাকে স্মরণ করে সে।

হঠাৎ তার নজরে পড়ে, ওদিকে দেয়ালে একটা সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা টাঙানো রয়েছে। মনিরার মনে কিঞ্চিৎ ভরসা হয়। কোনরকমে ঐ ছোরাখানার নিকটে পৌঁছতে পারলে সে একবার দেখে নিত। হয় ওর প্রাণ নেবে, নয় নিজের জীবন বিসর্জন দেবে মনিরা। কেউ জানবে না কোথায় হারিয়ে গেছে সে।

লোকটা যতই এগুচ্ছে মনিরা ততই পিচু হটছে, একটু একটু করে সরে যাচ্ছে সে ওদিকে দেয়ালের দিকে।

লোকটা মনিরাকে ধরতে গেলে। অমনি মনিরা পিছু হটতে গিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

লোকটা এবার ধরে ফেলল মনিরাকে, আকর্ষণ করলো নিজের দিকে।

মনিরা খুব জোরে লোকটার হাত কামড়ে দিল।

অসহ্য যন্ত্রণায় লোকটা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো। ছেড়ে দিল ওকে।

মনিরা তৎক্ষণাৎ মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়ে দেয়াল থেকে ছোরাখানা তুলে নিল, তারপর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললো– এবার এসো তুমি আমার কাছে। তোমার রক্ত আমি শুষে নেব এটা দিয়ে।

লোকটার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। কোন কথা বললো না সে। তার হাত থেকে তখন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মনিরার দাঁতের আঘাতে লোকটার হাতে বেশ ক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

লোকটা মনিরার দিকে না এগিয়ে বললো– এখনকার মত আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম যুবতী। আবার আসবো।

মনিরা দাঁতে দাঁত পিষে বললো– এই ছুরি তখন তোমার জবাব দেবে।

বেশ, তাই হবে। লোকটা বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

মনিরা ছুটে আসে দরজার পাশে, ততক্ষণে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

মনিরা কি করবে ভেবে পায় না। আত্মহত্যা করবে কি? হাতের সুতীক্ষ্ণধার ছোরাখানার দিকে তাকায় মনিরা। এখনই লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারে সে। লৌহশিকলেও তখন তাকে কেউ আটকাতে সক্ষম হবে না, বন্ধ ঘরে শুধু পড়ে থাকবে তার প্রাণহীন দেহটা।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো মনিরা। নিজেকে রক্ষা করার মত কোন পথই সে খুঁজে পেল না। মৃত্যু ছাড়া এখন তার রক্ষা নেই।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল।

মনিরা সচকিতভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, এখনও তার হাতে রয়েছে সেই ছোরাখানা।

সেই রাজাধিরাজ আবার এসেছে। কক্ষের বৈদ্যুতিক আলোতে লোকটার পোশাক ঝকমক করছে।

মনিরার দু'চোখে আগুন ঝরে পড়তে লাগলো। এই তার শেষ মুহূর্ত – হয় লোকটাকে হত্যা করে মুক্ত হবে, নয় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এ জীবনের সমাপ্তি ঘটাবে। প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল মনিরা।

লোকটার মুখে এখনও দুষ্টামির হাসি ফুটে রয়েছে। এবার সে মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো– মনস্থির করেছ? ভিখারিণী, তোমাকে আমি রাজরাণী করবো।

তোমার মত রাজাকে আমি ঘৃণা করি, অর্থের লোভ দেখিয়ে তুমি এভাবে মেয়েদের সর্বনাশ কর।

কি, এতবড় কথা তুমি বললে আমাকে।

লোকটা এবার খপ করে মনিরাকে ধরে ফেললো। মনিরা নিজকে রক্ষার জন্য ছোরাখানা বসিয়ে দিতে গেল লোকটার বুকে।

লোকটা চট করে তার বলিষ্ঠ মুঠায় মনিরার ছোরাসহ হাতখানা ধরে ফেলল। তারপর অতি সহজে মনিরার কোমল হাতের মুঠা থেকে ছোরাখানা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

মনিরা আপ্রাণ চেষ্টায় নিজকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। লোকটা ততক্ষণে মনিরার নাকের ওপর একটা ঔষধ মেশানো রুমাল চেপে ধরলো।

ধীরে ধীরে মনিরা এলিয়ে পড়লো সেই রাজাধিরাজ লোকটার বলিষ্ঠ বাহুর ওপর।

◆

মনিরাকে বিদায় না দিয়ে সেদিন উপায় ছিল না মরিয়ম বেগমের। এমন জেদী মেয়ে, যা সে জেদ ধরবে তা করবেই। তা ছাড়া মনিরের জন্য সে যে রকম অস্থির হয়ে পড়েছিল তাতে মরিয়ম বেগম নিজেও অত্যন্ত ভাবাপন্ন হয়েছিলেন। কাজেই মনিরাকে সেদিন তিনি কতকটা বাধ্য হয়েই বিদায় দিয়েছিলেন।

কিন্তু মনিরা চলে যাবার পরই তিনি মনে মনে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। যুবতী মেয়ে, কোথায় যাবে– কোন্ না কোন্ বিপদে পড়বে। কোথায় থাকবে, কোথায় কে তাকে আশ্রয় দেবে? তবে ভরসা ছিল মনিরা অশিক্ষিত মেয়ে নয়– জ্ঞান-বুদ্ধি তার বেশ রয়েছে, নিজেকে বাঁচিয়ে চলার মত ক্ষমতা আছে তার। কিন্তু পরক্ষণেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো– তবু তো মেয়েছেলে!

বেশ কয়েকদিন যখন কেটে গেল মনিরা ফিরে এলো না, তখন মরিয়ম বেগম বিচলিত হয়ে পড়লেন।

ঘটনাটা তিনি গোপনে সরকার সাহেবকে বলেছিলেন। সরকার সাহেব তো মরিয়ম বেগমের মুখে ব্যাপারটা শুনে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয়নি।

তারপর বলেছিলেন– এ আপনি কি করেছেন বেগম সাহেবা! একটা মেয়েকে আপনি তার খেয়ালের বশে একা যেতে দিয়েছেন। আপনাদের

দু'জনেরই কি মাথা খারাপ হয়েছিল? এর বেশি আর কিছু বলেননি সরকার সাহেব, তিনি তখনই বেরিয়ে পড়েছিলেন মনিরার সন্ধানে।

দু'দিন পর ফিরে এসেছিলেন সরকার সাহেব। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন। কোন কথা তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়নি।

মরিয়ম বেগম আশঙ্কিত কণ্ঠে বলেছিলেন– কোন খোঁজ পেলেন না?

হতাশ কণ্ঠে বলেছিলেন সরকার সাহেব– কোথায় খুঁজে পাবো! একি গরু-ছাগল যে খুঁজে বের করব? রাগে ক্ষোভে সরকার সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। না হলে তিনি এতবড় কথাটা মনিব-গৃহিণীর সামনে বলতে পারতেন না।

মরিয়ম বেগমও আর তাকে প্রশ্ন করতে পারেননি, নিজের ভুল তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। মনিরাকে অমনভাবে ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছেন, বুঝতে পারেন মরিয়ম বেগম।

কাজেই নিশ্চুপ থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। মরিয়ম বেগম মুখে যতই চুপ থাকতে চেষ্টা করুন না কেন, অন্তরে অন্তরে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। চোখে তাঁর ঘুম ছিল না? নাওয়া-খাওয়ার কোন ঠিক ছিল না। সব সময় মনিরার জন্য চিন্তা করতেন মরিয়ম বেগম।

সেদিন গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন, না জানি মেয়েটা আজ কোথায় কেমন আছে?

ভালো আছে না কোন বিপদে পড়েছে কে জানে? কে তাকে মনিরার সন্ধান এনে দেবে? মনির– সে তো আজ কতদিন হল আসে না। সেই বা কোথায় আছে কে বলবে। মরিয়ম বেগমের মনে নানা রকম চিন্তা হয়।

একমাত্র সন্তান মনির যখন ছয়-সাত বছর বয়সে ছিল তখনই মরিয়ম বেগম বুঝতে পেরেছিলেন আর কোন সন্তান তাঁদের হবে না। মনিরই তাদের বংশের একমাত্র সম্বল। ওকে নিয়েই মরিয়ম বেগম এবং চৌধুরী সাহেব কত আকাশকুসুম স্বপ্ন রচনা করেছিলেন। কত আশা, কত বাসনা

উঁকি দিয়ে যেত সেদিন ঐ দুটি প্রাণে। পুত্রকে মানুষ করবেন, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, দশ জনের মধ্যে সে যেন একজন হতে পারে, এমনিভাবে গড়ে তুলবেন পুত্রকে। কিন্তু সব আশা তাঁদের ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র সন্তান, নয়নের মনি, হৃদয়ের ধন মনিরকে তাঁরা নদীবক্ষে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

এমন কত চিন্তাই না মরিয়ম বেগমের মনে ভেসে উঠে আবার মুছে যাচ্ছিল। কিছুতেই ঘুমাতে পারছিলেন না তিনি। দেয়ালঘড়িটা টিক্‌টিক করে বেজে চলেছে। রাত তিনটে হবে।

হঠাৎ একটা শব্দে চমকে ওঠেন মরিয়ম বেগম। দরজায় ঠক ঠক্ করে একটা আওয়াজ শুনতে পান তিনি।

সজাগ হয়ে বিছানায় উঠে বসেন।

আবার সেই শব্দ– ঠক্ ঠক্ ঠক্। পরক্ষণেই একটা অতি পরিচিত মধুর কণ্ঠস্বর– মা, মাগো, দরজা খোল।

মুহূর্তে মরিয়ম বেগমের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠে, এ-যে তার মনিরের কণ্ঠস্বর। এ কণ্ঠস্বর যে তাঁর অন্তরের কানায় কানায় গাঁথা রয়েছে, এ যে তারই কণ্ঠ।

মরিয়ম বেগম ধড়মড় করে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে আর্তকণ্ঠে বলেন –একি। কি হয়েছে ওর?

তিনি দেখতে পান মনিরের হাতের ওপর ছিন্নলতার মত এলিয়ে রয়েছে মনিরার দেহখানা।

বনহুর মনিরার সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে তারপর শুইয়ে দেয় বিছানায়।

মরিয়ম বেগম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। দু'চোখে তার অপরাধীর ছাপ ফুটে উঠেছে। কোন কথা বলবার মত সাহস তিনি পাচ্ছেন না।

বনহুর মনিরার সংজ্ঞাহীন দেহটা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ফিরে তাকায় মায়ের মুখের দিকে।

মরিয়ম বেগম কিছু বলতে গিয়ে থেমে যান।

বনহুর বেশ কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে বলে–মা, আমি জানি, মনিরা তোমার অমতে এ কাজ করেছে। কিন্তু এটা মোটেই উচিত হয়নি।

ওর কি হয়েছে বাবা?

কিছু না।

এতদিন তুই আসিস্নি বলেই তো....

আমি তো এ কথা তোমাকে প্রথমেই বলেছিলাম মা! আমার সঙ্গে বিয়ে হলে মনিরা কোনদিন সুখী হতে পারবে না।

মনির!

মা, তুমি জানো না আমার জীবন কত বেদনাময়। কত সময় আমি নিজেকে খুঁজে পাই না, হারিয়ে যাই কোন অজানার মধ্যে। এ বিয়েতে শুধু মনিরাই নয়, তুমিও কোনদিন সুখী হতে পারবে না।

মনির, এসব তুই কি বলছিস? আগে বল, মনিরার অমন অবস্থা কেন? কি হয়েছে ওর?

তুমি ব্যস্ত হচ্ছো কেন মা, তোমার মনিরা ভালই আছে, এখনই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। কিন্তু এভাবে ওর যাওয়া মোটেই ঠিক হয়নি।

কি জানি বাবা, এতসব আমার কপালে ছিল! আমি কত করে বারণ করেছি তবু শুনলো না, বললো কি জানিস– আমি যদি তোমার পুত্রবধু হয়ে থাকি তবে যেখানেই থাকি কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না। হঠাৎ মনিরার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন মরিয়ম বেগম– ঐ যে মার আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

বনহুর একপাশে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, মনিরাকে চোখ মেলতে দেখে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়।

মরিয়ম বেগম ঝুঁকে পড়েন মনিরার মুখের ওপর- মা মনিরা, এখন কেমন লাগছে মা?

মামীমা, আমি বাড়িতে এলাম কি করে। মনিরা উঠে বসতে যায়।

মরিয়ম বেগম ওকে শুইয়ে দিয়ে বললেন- সব জানতে পারবি, এখন শুয়ে থাক্ বাছা।

না মামীমা, তুমি বলো, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে বনহুর- তোমার জীবনের সবই স্বপ্ন মনিরা, খেয়ালের বশে তুমি সব...........

এতক্ষণ মনিরা বনহুরকে লক্ষ্য করেনি, এবার কি যে এক আনন্দ শিহরণ বয়ে যায় তার শিরায় শিরায়। নির্ণিমেষ নয়নে তাকায় মনিরা ওপাশে দাঁড়ানো বনহুরের দিকে।

মরিয়ম বেগম বললেন- মনিরার জন্য একটু দুধ গরম করে আনিগে।

বেরিয়ে যান তিনি। মনিরা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়, যদিও মাথাটা তার এখনও ঝিমঝিম করছে তবু উঠে গিয়ে বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে- বলো, তুমি কোথায় ছিলে এতদিন? বলো জবাব দাও?

আমাকে তুমি ভুলে যাও মনিরা।

মনির! একি বলছো তুমি!

প্রথমেই বলেছিলাম, যা করছো তাতে তুমি সুখী হবে না।

কে বললো আমি সুখী নই?

সুখীই যদি হবে তাহলে এভাবে ঘর ছেড়ে.......

তা তো তোমারই জন্য। কিন্তু..... কিন্তু আমি এখানে এলাম কি করে। কোথায় সেই রাজ প্রাসাদ, কোথায় সেই নরপিশাচ যে আমাকে...... ও বুঝেছি, তুমি- তুমিই আমাকে ওর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছ। এবার

আমি সব বুঝতে পারছি। সত্যি মনির এ যে আমি কল্পনাও করতে পারছি না-------

মনিরাকে সরিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে বনহুর– যদি বলি তোমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছি।

মনিরার মুখমণ্ডল মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে ওঠে, বনহুরের জামার আস্তিন থেকে হাতখানা খসে আসে ধীরে ধীরে। দৃষ্টি নত করে নেয় মনিরা। নিজকে একটা নগণ্য কীটের চেয়ে হীন বলে মনে হয় তার। একি শুনলো সে। তবে কি সে ঐ নরপিশাচের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি। ভয়ে শিউরে উঠলো মনিরার হৃদয়, ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ, একটা ঝড় বইতে শুরু করলো ওর মনে।

বনহুর মনিরার মুখোভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো, তার মনে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়েছে।

বনহুর এগিয়ে এলো মনিরার দিকে, বললো– এমন ভুল আর কোনদিন তুমি করবে না। ধরতে গেল বনহুর মনিরাকে। মনিরা অমনি সরে দাঁড়ালো, তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলো – না না, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না। সত্যিই যদি আমার এ দেহ কলুষিত হয়ে থাকে আমাকে যদি কোনো পর পুরুষ স্পর্শ করে থাকে, তবে এ জীবন নিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। তোমার পবিত্র দেহ আমি অপবিত্র করতে চাই না। স্পর্শ করো না--করো না আমাকে.--- মনিরা ছুটে যায় মুক্ত জানালার দিকে, লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে।

বনহুর মনিরার মনোভাব বুঝতে পেরে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে খপ করে ধরে ফেলে ওকে।

মনিরা বলে ওঠে– না না, ছেড়ে দাও আমাকে..... মনিরা জোর করে বনহুরের হাত ছাড়িয়ে নিতে যায়। অমনি নজরে পড়ে বনহুরের হাতের পিঠে একটা ক্ষত তখনও রক্তের দাগ রয়েছে। চমকে ওঠে মনিরা, এ যে তারই দাঁতের কামড়ানোর চিহ্ন। মনিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের হাতের ক্ষতটার দিকে।

বনহুর বুঝতে পারে, মনিরার মনে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে মনিরা।

বনহুর হেসে বললো– এ তোমারই দেওয়া পুরস্কার।

মনিরা বিস্ময়ভরা চোখে তাকায় বনহুরের উজ্জ্বল দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে, বলে ওঠে – তবে কি, তবে কি সেই রাজা----

হ্যাঁ মনিরা, সেই মহারাজ আর কেউ নয়– দস্যু বনহুর।

অস্ফুট ধ্বনি করে বনহুরের বুকে মুখ লুকালো মনিরা। অনাবিল একটা আনন্দ তার মনকে সচ্ছ করে দিল। এত আনন্দ বুঝি জীবনে মনিরা কোনোদিন পায়নি। আত্মহারা হয়ে গেল সে। বেশ কিছুক্ষণ লাগলো মনিরার নিজকে সামলে নিতে। তারপর বললো– কেন তুমি আমাকে এভাবে পরীক্ষা করতে গেলে?

তোমার ভুলের জন্য কিছুটা শাস্তির প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু তুমিও কম শাস্তি পাওনি। দেখো তো ভয়ানক ক্ষতটা হয়েছে। ইস্ কত কষ্ট তুমি পেয়েছো, এসো ঔষধ লাগিয়ে বেঁধে দিই।

মনিরা বনহুরকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে, ঔষধ এনে সুন্দর করে হাতের ক্ষতটা বেঁধে দিতে লাগলো।

এমন সময় মরিয়ম বেগম দুটি গ্লোসে গরম দুধ নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন। কক্ষে প্রবেশের আগে একটু কেশে তিনি নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দেন বনহুর ও মনিরাকে।

মনিরা বনহুরের হাতের ক্ষত বেঁধে দিয়ে সরে দাঁড়ায়।

মরিয়ম বেগম আতঙ্কভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন –ওকি, মনিরের হাতে কি হয়েছে?

বনহুরই জবাব দেয়– গোলাপের কাঁটা ফুটেছিল মা।

সেকি বাবা, গোলাপের কাঁটা?

হ্যাঁ মা। জানো মা, ঐ গোলাপ তুলতে গেলে কাঁটার আঘাত খেতে হয়। হাত বাড়ায় বনহুর মায়ের দিকে–দাও।

মরিয়ম বেগম ছেলের হাতে দুধের গ্লোসটা দিয়ে অন্য গ্লেসটা মনিরার দিকে বাড়িয়ে ধরেন– নাও মা, খেয়ে নাও।

মনিরা দুধের গ্লোস হাতে নেয়।

মরিয়ম বেগম সেই ফাঁকে বেরিয়ে যান। অনাবিল এক আনন্দে তাঁর মাতৃহৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বনহুর দুধের খালি গ্লোসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে মনিরাকে টেনে নেয় কাছে। বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে সে– আজ কামড়ে দেখ। উঃ কি সাংঘাতিক মেয়ে তুমি!

নাগিনীর চেয়েও সাংঘাতিক তাই না?

তার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

পুলিশের রাইফেলের চেয়েও আমার দাঁত মারাত্মক অস্ত্র। দুধর্ষ দস্যু বনহুরকেও ঘায়েল করতে পারে।

হাসে ওরা দু'জন।

মনিরা বলে– কেন তুমি আমাকে এতদিন ভোগালে?

আমার ইচ্ছাকৃত কিছুই নয় মনিরা।

বড় নির্দয় তুমি।

সেকি তুমি আজ নতুন করে আবিষ্কার করলে?

তাই বলে তুমি আমাকে এমনি করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাঁদাবে? আমি জানি তোমাকে যে-ই ভালবেসেছে সেই কেঁদেছে, তাই বলে তুমি সবাইকে কাঁদাবে?

আমি তো বললাম ইচ্ছাকৃত আমার কিছুই নয়। মনিরা, তুমি বুঝবে না আমি কত নিষ্ঠুর, কত হৃদয়হীন।

সব আমি জানি।

সব জেনেও তুমি আমাকে ভালবাসতে পার? সত্যি বড় আশ্চর্য মেয়ে তুমি।

তার চেয়ে আশ্চর্য তুমি। নরহত্যা আর লুট ছাড়া তোমার কি অন্য কাজ নেই? কেন হত্যা করো, বলো কেন, বলো কেন তুমি হত্যা করো? হত্যার নেশায় তুমি পাগল হয়ে যাও কেন?

বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর কঠিন হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো– অন্যায় আমার কোনদিন সহ্য হয় না মনিরা। অন্যায়কে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারি না। শুধু হত্যাই নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি সব করতে পারি।

মনির।

বল?

তুমি কি কোনদিন শান্ত হবে না?

বোধ হয় না।

চিরদিন তুমি লুট আর হত্যা নিয়েই থাকবে?

যদি থাকতে হয় থাকবো। মনিরা, তুমি কোনদিন আমার কাজে বাধা দিতে এসো না। তাহলে যেটুকু আমাকে পেয়েছো তাও পাবে না।

উহ! এ কথা বলতে তোমার এতটুকু বাঁধলো না। তোমাকে না পাওয়ার ব্যথা যে আমার কাছে মৃত্যুর চেয়েও বেদনার।

মনিরা।

বল?

আর কোনদিন তুমি আমার সন্ধানে যাবে না।

তুমি যদি এসো, কোনোদিন আমি যাবো না।

আসবো, তোমাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারবো মনিরা?

আচ্ছা বলতো, সেদিন তুমি কি করে আমায় চিনে অমনভাবে আটক করেছিলে?

আমার চোখে শিয়ালের মত ধূর্ত নাথুরাম কোনদিন ধূলো দিতে পারেনি– আর তুমি দেবে? যেদিন তুমি এভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছ, ঐ দিনই আমি সংবাদ পেয়েছি। তুমি একা একা ঘুরে বেড়ালেও আমার লোক সব সময় তোমার পেছনে পেছনে ছায়ার মত ছিল।

এতসব জেনেও তুমি আমাকে এত ভুগিয়েছ?

দেখতে চেয়েছিলাম, কতদূর তুমি সহ্য করতে পারো।

পাষণ্ড কোথাকার।

ইচ্ছা করে তোমাকে ধরা না দিলে কোনদিন তুমি আমার দেখা পেতে না, কাজেই আর কোনদিন তুমি অমন কাজ করবে না।

বেশ, করবো না।

হ্যাঁ, মনে রেখ মনিরা, আমি তোমারই।

মনির। সত্যি আজ আমার কি আনন্দ-----মনিরা বনহুরের বুকে মাথা রাখলো।

□

পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ হুঙ্কার ছাড়লেন– আমাদের পুলিশমহল কি এতই অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে যে, দস্যু বনহুর তাদের চোখের সামনে লুটতরাজ আর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে যাচ্ছে আর তার কোনই সুব্যবস্থা হচ্ছে না– এসব কি পুলিশমহলের কলঙ্কের কথা নয়!

পাশাপাশি কয়েকখানা চেয়ারে বসেছিলেন মিঃ জাফরী, মিঃ হোসেন, মিঃ শঙ্কর রাও, মিঃ হারেস, মিঃ হামিদ এবং মিঃ হারুন। সকলের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাবাপন্ন। একটা অস্বস্তির ছাপ যেন সকলের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

মিঃ জাফরীর ললাটে গভীর চিন্তা রেখা। তাঁর জীবনে এই প্রথম পরাজয়। দস্যু বনহুরকে তিনি হাতের মুঠোয় পেয়েও গ্রেফতার করতে সক্ষম হলে না, এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে!

মিঃ জাফরী বললেন– স্যার, আমি শপথ করছি, এবার আমি দস্যু বনহুরকে যদি পাকড়াও করতে না পারি, তাহলে পদত্যাগ করবো।

কক্ষস্থ সকলে একসঙ্গে তাকালেন মিঃ জাফরীর ভাবগম্ভীর কঠিন চেহারার দিকে। অগ্নিদগ্ধ ইস্পাতের মত রাঙা হয়ে উঠেছে তাঁর মুখমণ্ডল।

কিছুক্ষণ কক্ষে নিস্তব্ধতা বিরাজ করে।

মিঃ জাফরীর এই শপথ গ্রহণ সকলের মনেই একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে।

পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ এবার মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন– থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ জাফরী, আপনি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কৃতকার্য হবেন বলে

আশা করি। তারপর অন্যান্য পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন– আপনারা তাঁকে সাহায্য করবেন।

মিঃ হারুন সকলের পক্ষ হয়ে বললেন— নিশ্চয়ই করবো স্যার, আমরা সর্বান্তকরণে তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবো।

এরপর বিদায়ের পালা।

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার যে যার গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

মিঃ জাফরীর গাড়ি বাসার দিকে না গিয়ে শঙ্কর রাওয়ের গাড়ি খানাকে অনুসরণ করলো।

মিঃ রাও বারান্দায় গাড়ি রেখে নেমে দাঁড়াতেই মিঃ জাফরীর গাড়ি প্রবেশ করলো সেখানে।

মিঃ রাও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন– স্যার আপনি!

জরুরী কথা আছে, আসুন ভেতরে গিয়ে বসি। মিঃ জাফরী গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

মিঃ জাফরী এবং শঙ্কর রাওয়ের মধ্যে বহুক্ষণ গোপনে আলোচনা চললো।

তারপর সেদিনের মত শঙ্কর রাওয়ের বাসা থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন মিঃ জাফরী।

হোটেল রক্সি!

শহরের সেরা হোটেল।

কত লোক আসছে যাচ্ছে, তার কোন হদিস নেই।

হোটেলের একপাশের টেবিলে বসে চা পান করছেন দু'জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। চা পানের ফাঁকে ফাঁকে নিম্নস্বরে কিছু আলাপ- আলোচনা হচ্ছিল তাঁদের মধ্যে।

মাড়োয়ারীদ্বয় যে বেশ ধনী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চা পান শেষ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন মাড়োয়ারীদ্বয়, এবার তাঁরা একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলেন। বয়স্ক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি ড্রাইভারকে বললেন– ন্যাশনাল ব্যাংকে চলো।

ট্যাক্সি ন্যাশনাল ব্যাংকের উদ্দেশ্যে ছুটতে শুরু করলো।

অল্পক্ষণেই এপথ সেপথ ঘুরে ব্যাংকের সামনে এসে গাড়ি থামালো।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দু'জন গাড়ি থেকে নেমে ব্যাঙ্কের ভেতরে প্রবেশ করলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো পূর্বের গাড়িখানার পাশে। একটা যুবক গাড়ি থেকে নেমে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো, তারপর অগ্রসর হলো ব্যাংকের দিকে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর যুবক ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। গাড়ি চলতে শুরু করলো।

যুবকের গাড়ি চলে যেতেই, মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদ্বয় এটাচী ব্যাগ হাতে গাড়িতে এসে বসলেন।

এটাচী ব্যাগটা তাদের একজনের হাতে আগে থেকেই ছিল, এবার ব্যাগটা বেশ ভারী বলে মনে হচ্ছে।

গাড়িতে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদ্বয় বেশ হেসে হেসে আলাপ করছিলেন।

হঠাৎ মাড়োয়ারীদ্বয়ের একজন নিচে তাকিয়ে দেখতে পান একটা ভাঁজকরা কাগজ পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি কাগজখানা হাতে তুলে নিয়ে মেলে ধরেন চোখের সামনে। দ্বিতীয় জনও তাকান সেইদিকে। কাগজখানায় গাঢ় লাল কালিতে লেখা ঃ

যে বিশ হাজার টাকা তোমরা নিয়ে যাচ্ছো
তা থেকে আমাকে কমপক্ষে দশ হাজার দিতে
হবে। নচেৎ তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য। এই
গাড়ির মধ্যেই আমার প্রয়োজনীয় টাকা রেখে নেমে যাবে।

তোমাদের অজ্ঞাত
'বন্ধু'

মাড়োয়ারীদ্বয়ের একজন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন– অজ্ঞাত বন্ধুই বটে!

হ্যাঁ, তা না হলে টাকা চাইবার সাহস কার আছে? কিন্তু আপনি কি মনে করেন টাকা না দিয়েই চলে যাবেন? দ্বিতীয় জন বললেন।

প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন– বন্ধু যখন টাকা চাইছে, না দিয়েই বা উপায় কি! কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ড্রাইভারের পিঠে রিভলবার চেপে ধরে চাপাকণ্ঠে বললেন– গলির মধ্যে গাড়ি নিয়ে চলো।

ড্রাইভার চমকে ওঠে। পেছন ফিরে তাকাবার সাহস হয় না তার। সামনেই গলি, সেই গলির মধ্যে গাড়ি নিয়ে যায় ড্রাইভার।

তখনও সে পিঠে হিমশীতল একটা জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করে। এবার সে শুনতে পায়– গাড়ি থামাও!

ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ফেলে ড্রাইভার। মুখখানা তার ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

গাড়ি থামতেই প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোক গাড়িতে পাওয়া চিঠিখানা মেলে ধরেন তার সামনে– এ চিঠি কে রেখেছে?

ড্রাইভার চিঠির লেখাগুলোতে দৃষ্টি বুলিয়ে বলে– হুজুর, আমি এ চিঠি সম্বন্ধে কিছু জানিনা।

গর্জে ওঠেন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক– নেকামি করো না, সত্য করে বলো– এ চিঠি গাড়িতে কি করে এলো?

হুজুর, আমি সত্য বলছি, ও চিঠি সম্বন্ধে কিছু জানি না।

এ গাড়ির মালিক কে?

শ্যামলাল বাবু– ঐ যে চৌ-রাস্তায় মদের দোকান আছে যার। আর বলতে হবে না।

দ্বিতীয় মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন– গাড়ির মালিক এ ব্যাপারে আমার মনে হয় কিছুই জানে না।

প্রথম মাড়োয়ারী বললেন– গাড়ি ছাড়ো।

ড্রাইভার বলল– কোথায় যাব?

সেই অজ্ঞাত বন্ধুর খোঁজে। তাকে টাকা না দিয়ে যাই কি করে?

প্রথম মাড়োয়ারীর কথায় দ্বিতীয় মাড়োয়ারী বললেন– ঐ সামান্য একটা চিঠির ভয়ে দশ হাজার টাকা দেবেন?

তাছাড়া উপায় কি?

গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে।

গলি থেকে বেরিয়ে এবার বড় রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করে।

প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটার মুখমণ্ডল কঠিন ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ পাশে বিশ হাজার টাকার এটাচী ব্যাগ রেখে সামনে তাকিয়ে বসে আছেন।

ড্রাইভারকে বলে দিলেন– পার্ক রোড ধরে লেকের ধারে গাড়ি নিয়ে চলো।

ড্রাইভার সেইভাবে গাড়ি চালাতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি নির্জন লেকের ধারে এসে থেমে পড়লো। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়লেন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদ্বয়। সেই গাড়িটা সামান্য কিছু অগ্রসর হতেই অন্য একটা ট্যাক্সি ডেকে তাঁরা চেপে বসলেন এবং সামনের গাড়িখানাকে ফলো করতে বললেন।

মাড়োয়ারীদ্বয়ের গাড়ি সামনের খালি গাড়িখানা থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগলো।

সামনের গাড়িখানা আরোহীর আশায় ধীর ধীরে চলছিল। এক জায়গায় এসে সামনের গাড়িখানা থেমে পড়লো। একটা বয়স্ক ভদ্রলোক উঠে বসলেন গাড়িখানাতে।

মাড়োয়ারীদ্বয়ের একজন ড্রাইভারকে বললেন –ঐ গাড়িখানাকে অনুসরণ করো। খুব হুশিয়ার হয়ে গাড়ি চালাবে, দেখো সামনের গাড়িখানা যেন টের না পায়!

ড্রাইভার জবাব দিল– আচ্ছা স্যার।

আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে সামনের গাড়িখানা এগুচ্ছে।

পেছনের গাড়িখানা। সামনের গাড়ি থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে।

প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দ্বিতীয় জনকে বললেন– নিশ্চয়ই আমাদের অজ্ঞাত বন্ধু তার চাওয়া টাকার অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। এবার আমরা কি করতে পারি?

ঐ গাড়ির আরোহীকে আমি ফলো করবো, সে কোথায় যায় এবং কি করে দেখব।

তার পূর্বেই যদি আমাদের জন্য সে মৃত্যুর ব্যবস্থা করে?

মাথা পেতে বরণ করতে হবে।

একি! গাড়িখানা এবার নির্জন পথ ধরে একটা বস্তির দিকে এগুচ্ছে।

প্রথম মাড়োয়ারী বললেন- ড্রাইভার, এবার ঐ গাড়ির পাশ কেটে তোমাকে সামনে যেতে হবে। ঐ যে ওখানে একটা ফাঁকা জায়গা দেখছো, সেখানে তোমাকে গাড়িখানাকে পাশ কেটে উঠতে হবে।

আচ্ছা স্যার। ড্রাইভার এবার গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সামনের গাড়িখানার পাশ কেটে পেছনের গাড়ি এগিয়ে গেল।

ড্রাইভারের নিপুণ দক্ষতায় খুশী হলেন মাড়োয়ারীদ্বয়।

প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এবার সামনের গাড়িখানার পথ রোধ করে দাঁড়াবার নির্দেশ দিলেন।

সামনের গাড়ির বাঁধা পাওয়ায় পেছনের গাড়ি থেমে পড়তে বাধ্য হলো।

মাড়োয়ারীদ্বয় দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে পেছনের গাড়ির আরোহী ভদ্রলোকের সামনে এসে দাঁড়ালেন, দু'জন একসঙ্গে রিভলবার তুলে ধরলেন। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক চাপাকণ্ঠে বললেন—হ্যান্ডস আপ!

দ্বিতীয় গাড়ির আরোহী মৃদু হাসলো, তারপর বললো- থ্যাঙ্ক ইউ, আপনারা দেখছি খাস মাড়োয়ারী বনে গেছেন।

মাড়োয়ারীদ্বয় মুহূর্তে হাত নামিয়ে সেলুট করলেন। তারপর কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে প্রথমজন বললেন- স্যার, মাফ করবেন, আপনাকে চিনতে পারিনি!

মিঃ জাফরী হাসলেন- এই বুদ্ধি নিয়ে আমরা দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে নেমেছি। মিঃ রাও, আপনার সঙ্গীটি......

ইয়েস স্যার, আমার সহকারী গোপাল বাবু।

আচ্ছা, টাকাগুলো ঠিকভাবে উঠিয়ে নিতে পেরেছেন তো?

হ্যাঁ স্যার, টাকাগুলো ঠিকভাবেই উঠাতে পেরেছি। কিন্তু---

কিন্তু কি?

অনেক কথা আছে স্যার আপনার সঙ্গে।

আপনার গাড়ি ছেড়ে চলে আসুন এ গাড়িতে।

দ্বিতীয় মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের বেশে গোপাল বাবু বলে ওঠেন –ব্যাগটা কিন্তু এখনও গাড়িতেই রয়েছে।

হোয়াট! অবাক করলেন, টাকার ব্যাগ গাড়িতে রেখে নেমে গেছেন আপনারা।

স্যার অতি দ্রুত ...

বুঝেছি ....দ্রুত আমাকে পাকড়াও করতে গিয়ে-------

ততক্ষণে ড্রাইভার এটাচী হাতে এগিয়ে আসে– হুজুর, আপনারা এটা গাড়িতে ফেলেই..

দাও। মাড়োয়ারীবেশি শঙ্কর রাও ড্রাইভারের হাত থেকে এটাচীখানা নেন। তারপর গোপাল বাবুকে ওর ভাড়া মিটিয়ে দিতে বলেন।

মিঃ জাফরী একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে গাড়িতে বসেছিলেন। এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ তিনি ধরেছিলেন, তাঁকে চেনা মুস্কিল ছিল যদি নিজে কথা না বলতেন।

গোপাল বাবু যখন গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছিলেন তখন মিঃ জাফরী নিপুণভাবে লক্ষ্য করছিলেন ড্রাইভারটাকে।

শঙ্কর রাও এটাচী খুলে দেখে নিচ্ছিলেন টাকাগুলো ঠিক আছে কিনা।

না, টাকাগুলো ঠিকই রয়েছে। ড্রাইভারকে সন্দেহ করার কিছু নেই।

ড্রাইভার তার ভাড়া বুঝে নিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিতেই মিঃ জাফরী বাঘের মত হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়লেন এবং রিভলবার উদ্যত করে উঠলেন– ওকে পাকড়াও করুন। পাকড়াও করুন.... সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জাফরীর রিভলবার গর্জন করে উঠলো।

কিন্তু কি আশ্চর্য, ততক্ষণে গাড়িখানা যেন হাওয়ায় মিশে গেল, এক নিমিষে উধাও হয়েছে গাড়িটা। শুধু মিঃ জাফরীর রিভলবারের একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে।

মিঃ জাফরী হঠাৎ গাড়ির ড্রাইভারকে এভাবে আক্রমণ করায় শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু হকচকিয়ে যান। তাঁদের টাকার একটি পয়সাও যায়নি, অথচ.......

শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবুকে লক্ষ্য করে মিঃ জাফরী ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন– শিগগির ঐ গাড়িখানাকে ফলো করুন।

শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু সামনে তাকালেন, অসংখ্য গাড়ির ভীড়ে সেই গাড়িখানা অদৃশ্য হয়েছে।

মিঃ জাফরী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। মিঃ রাও বললেন– স্যার, ও গাড়িখানা কার?

মিঃ জাফরী রুদ্ধকণ্ঠে বললেন– দস্যু বনহুরের!

বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু—দস্যু বনহুর! বলেন কি স্যার!

মিঃ জাফরী বললেন –যখন এটাচীতে আপনাদের টাকা অক্ষত অবস্থায় আছে জানতে পারলাম তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল, সাধারণ লোক হলে এত সহজে সে এতগুলো টাকার লোভ সামলাতে পারত না। তখন আমি ভালভাবে লক্ষ্য করি। আলম সাহেবের বেশে বনহুরকে বেশ কিছুদিন আমি পাশে পেয়েছিলাম। কজেই তাকে চিনতে আমার বেশি কষ্ট হয়নি। কিন্তু হাতের কাছে পেয়েও পেলাম না.----গ্রেফতার করতে পারলাম না। অধর দংশন করেন মিঃ জাফরী।

কিন্তু তিনি আশ্বস্ত হন, দস্যু বনহুরকে চিনতে তাঁর বেশি বেগ পেতে হয়নি।

মিঃ জাফরী, শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু তাঁদের নিজস্ব ভাড়াটিয়া গাড়িতে উঠে বসলেন।

◆

অন্ধ রাজা মোহন্ত সেন তাঁর বিশ্রামকক্ষে বসে গম্ভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। মনে পড়ছিল তার সেদিনের কথা– সেই অজানা বন্ধু যে তাঁকে সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিল, তার কথা।

সেদিন রাজা মোহন্ত সেন তাঁর অজানা বন্ধুকে এতটুকু ধন্যবাদ জানাবার সময়ও পাননি। সত্যি কত মহৎ, কত হৃদয়বান সেই অজানা লোকটা। এখন যদি একবার তাকে কাছে পেতেন তাহলে বুকে জড়িয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। যা পুরস্কার সে চাইতো তাই দিতেন তিনি ওকে।

মোহন্ত সেন যতই ভাবেন মনটা তাঁর ততই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। একটিবার সেই অজানা বন্ধুর সান্নিধ্য পাবার আশায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন তিনি।

মানুষ কথায় বলে যে যা চায়, যা কামনা করে, তাই সে পায়। মোহন্ত সেনের মনের ডাকে সাড়া দেয় তাঁর অজানা বন্ধু, পেছন দরজা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে রাজা মোহন্ত সেনের পাশে এসে দাঁড়ায়। সেই যে তাকে উদ্ধার করে বাড়ি পৌঁছে দেবার পর আর আসেনি সে। আজ তাকে দেখার জন্য সশরীরে হাজির হলো।

মোহন্ত সেনের কাঁধে হাত রাখতেই চমকে উঠলেন তিনি।

মোহন্ত সেন– কে?

তোমার সেই অজানা বন্ধু।

তুমি– তুমি এসেছো?

হ্যাঁ, এসেছি। কেমন আছ রাজা?

ঈশ্বরের কৃপায় আর তোমার দয়ায় ভাল আছি। বন্ধু, এই মুহূর্তে আমি তোমার কথাই স্মরণ করছিলাম।

তাই তো আমি এসেছি রাজা।

দু'হাত বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেন রাজা মোহন্ত সেন – তুমি, তুমিই কি..

হ্যাঁ, আমি....... আমিই দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর! শুনেছি তুমি ধনবানের শত্রু— গরীবের বন্ধু।

শুধু আমি গরীবের বন্ধু নই রাজা, অসহায়ের সাথীও।

তুমি কি পুরস্কার চাও বন্ধু বলো? যা চাবে তাই আমি তোমাকে দেবো। আমার প্রাণরক্ষার বিনিময়ে তুমি যা চাইবে ,তাই দেবো।

ভিক্ষুক আমি নই রাজা। প্রতিদানও আমি চাই না।

তবে কি চাও? রাজভাণ্ডারে আমার যত অর্থ আছে নিয়ে যাও। যা খুশি করো, আমি তোমাকে সব দিলাম।

তোমার মধুর ব্যবহার আমার কাছে তোমার রাজভাণ্ডারের সোনাদানা, মনিমুক্তার চেয়ে মূল্যবান। তোমার দয়ায়, তোমার গরীব প্রজাগণ সুখে আছে, তারা শান্তিতে বসবাস করছে— এটাই আমার বড় পাওয়া।

পিতাকে একা একা কথা বলতে শুনে চুপ চুপি উঁকি দেয় বাসবী দেবী। চমকে ওঠে সে, পিতার পাশে কে একজন রাজপুত্রের মত সুন্দর যুবক দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছে!

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে বাসবী দেবী। কে এই যুবক। পিতার কক্ষে কেমন করেই বা এলো? তারা গোটা বাড়ির লোক কেউ জানলো না- কোন পথে প্রবেশ করেছে?

যত দেখে বাসবী ততই মুগ্ধ হয়ে যায়। এত সুন্দর সুপুরুষ সে কোনদিন দেখেনি।

দস্যু বনহুরকে পূর্বে একদিন দেখেছে বাসবী, কিন্তু সেদিন কেউ তার চেহারা দেখতে পায়নি, বাসবীও না। আজ বাসবী প্রথম দেখাল তাকে।

দস্যু বনহুর রাজা মোহন্ত সেনের সঙ্গে কথা শেষ করে যে পথে কক্ষে প্রবেশ করেছিল, সেই পেছনে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

এবার বাসবী পিতার কক্ষে প্রবেশ করে ডাকে— বাবা!

চমকে ওঠেন রাজা মোহন্ত সেন। ভাবেন, বাসবী তো ওকে দেখেনি। আবার একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে না বসে! একটু কেশে বলেন- কে, মা বাসবী?

হ্যাঁ। আচ্ছা বাবা, বলো তো কার সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে?

ও কিছু না, ও কিছু না মা।

তুমি যে কথা বললে......

এমনি। বুড়ো মানুষ যা মনে আসে বলে ফেলি।

বাবা, আমি ছোট্ট খুকী নই, সব জানি। বলো কে ঐ যুবক যার সঙ্গে তুমি একটু পূর্বে আলাপ করছিলে?

বুঝেছি, তুই তাহলে লুকিয়ে দেখে ফেলেছিস, তাই না মা?

হ্যাঁ। বল কে সে?

ঐ ... ঐ .... ওকে তুই দেখেছিস। দেখেছিস মা?

দেখেছি বাবা।

কেমন দেখতে একটু বলতো মা?

খুব— খুব খারাপ দেখতে.......

না না, তা হতে পারে না। যার মন আকাশের মত উদার, যার হৃদয় সাগরের মত গভীর, যার দয়ার সীমা নেই, সে কখনও দেখতে খারাপ হতে পারে না মা, তুই তাহলে ভুল দেখেছিস।

বলনা কে সে?

আমার সেই অজানা বন্ধু।

মানে যে তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সেই দস্যু।

দস্যু নয় মা, দস্যু নয়—দেবতা।

বাসবীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিছু পূর্বে দেখা একখানা মুখ—অপূর্ব সুন্দর সে মুখ।

◆

মিঃ জাফরী নিজস্ব অফিস-রুমে ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করে চলেছেন। তাঁর সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন- এবার দস্যুকে সামনে পেলে গ্রেফতার নয়, হত্যা করবো। হত্যা ছাড়া তাকে বন্দী করা যাবে না।

স্যার, কখন রওয়ানা দেবেন? প্রশ্ন করেন শঙ্কর রাও। এখন রাত ক'টা বাজে মিঃ রাও?

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন শঙ্কর রাও—রাত এখন দুটো।

নৌকা কখন আসবে ঘাটে?

রাত তিনটেয় স্যার। আমাদের সঙ্গে কিছু পুলিশ নিলে হয় না?

না, পুলিশ ফোর্স নিয়ে আমি ঝামেলা বাড়াতে চাইনা। দু'জনই যথেষ্ট। কিন্তু ব্যাপারখানা তো কেউ জানতে পারেননি?

না স্যার, শুধু আপনি আর আমি ছাড়া এ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। আর জানে নৌকার মাঝি ফরিদ মিয়া।

তাকে কি করে বিশ্বাস করি?

বিশ্বাস করতে হবে স্যার। ফরিদ মিয়া আমাদেরই একজন। তা ছাড়া সে তো আমাদের সন্ধান দিয়েছে দস্যু বনহুর আগামী অমাবস্যার রাতে মধুমতী চরে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে টাকা-পয়সা আর অন্ন বিতরণ করবে। এ খবর তো আমরা তার কাছেই পেয়েছি।

মিঃ রাও, মনে রাখবেন, এর একচুল যদি মিথ্যা বা অসত্য হয়, তাহলে......

না স্যার, আমি নিজের চেয়ে ফরিদ মিয়াকে বেশি বিশ্বাস করি।

বেশ, চলুন।

এখনও কিছু সময় দেরী আছে স্যার।

রিভলবার, গুলি সব তৈরি আছে?

আছে।

রিভলবার নেবেন দুটো। একটা থাকবে লুকানো, আর একটা প্রকাশ্য। একটা হস্তচ্যুত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যটা ব্যবহার করবেন। দস্যু বনহুরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিনা দ্বিধায় গুলি ছুড়বেন। তাকে জীবিত গ্রেফতার করা সম্ভব নয়, তাই তাকে আমরা হত্যা করেই আনতে চাই।

রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মিঃ জাফরী এবং শঙ্কর রাও নৌকায় এসে উঠলেন।

আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে– ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ।

বিদ্যুতের আলোতে নৌকাখানা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। নৌকায় কোন আলো নেই।

মিঃ জাফরী এবং শঙ্কর রাও নৌকায় পৌঁছলেন। মাঝি ফরিদ মিয়া অন্ধকারে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালো।

মিঃ জাফরী অন্ধকারেও নিপুণভাবে ফরিদ মিয়াকে দেখে নিলেন। লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখে আশ্বস্ত হলেন তিনি। অতি সাদাসিদে লোক বলেই মনে হলো তার। তবু মিঃ জাফরী যতদূর সম্ভব পুলিশী কায়দায় ভয় দেখিয়ে ওকে যাচাই করে নিলেন এবং এ কথাও তিনি শুনে নিলেন সত্যিই দস্যু বনহুর আজ রাতে মধুমতী চলে যাবে কিনা।

ফরিদ মিয়া বললো—হুজুর, আমার নৌকা আজ বিশ বছর এই নদীর পাড়ি জমাচ্ছে। নদী চরে কোথায় কি হয় তাই যদি না জানলাম---

দস্যু বনহুর যে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে সাহায্য দান করবে তা কেমন করে জানলে?

হুজুর, আজ শুধু নয়— আরও কয়েক বছর সে এমনি করে মধুমতী চরে দান করেছে। আমরা তাকে জানি হুজুর। সে আমাদের কোন ক্ষতি করে না---

থাক, অত গল্প করতে হবে না, জোরে চালিয়ে চল। দেখ দাঁড়ের শব্দ যেন না হয়।

হলেই বা ক্ষতি কি হুজুর। ফরিদ মাঝি কাউকে ভয় করে না। দস্যুর বাবা এলেও না—কিন্তু হুজুর, আমার ভয় শুধু ঐ পবন বেটাকে।

কথাটা শুনে মিঃ জাফরীর বলিষ্ঠ প্রাণটাও একটু কেঁপে ওঠে। ছৈ-এর ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে একবার আকাশখানা দেখে নিলেন তিনি। আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। ঘন কাল মেঘ সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। একে অমাবস্যা রাত তার ওপর এই দুর্যোগপূর্ণ আকাশ। মিঃ জাফরী ভাবলেন, ফিরে যাওয়া যাক। ভয় হল, তিনি তো সাঁতার জানেন না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন তাঁর মত একজন সাহসী লোক যদি এই সামান্য কারণে আজ ফিরে যান, তাহলে নিজের কাছে নিজেরই লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। তা ছাড়া শঙ্কর রাও ও মাঝিটাই বা ভাববে কি?

মনকে শক্ত করে নিলেন মিঃ জাফরী, বুকে সাহস সঞ্চয় করে বললেন পবন বেটার সাধ্য কি আমাদের কাজে বাধা হয়। ফরিদ মিয়া, তোমাকে মোটা বখশিস দেব, তুমি সাবধানে শুধু মধুমতী চরে নৌকা ভিড়িয়ে দেবে। কেউ যেন টের না পায়।

না না হুজুর, আমি ঠিকভাবে পৌছে দেব, আপনারা চুপ করে বসে থাকুন।

শঙ্কর রাওয়ের কিন্তু মুখ ভয়ে চুণ হয়ে এসেছে। আকাশের অবস্থা তাঁর মনে একটা অমঙ্গলের বার্তা বয়ে আনছে, কোন কথা তাঁর মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না। মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগলেন তিনি। ফিরে যাবার কথাও মুখ ফুটে বলতে পারছেন না, মিঃ জাফরী যদি রেগে যান!

নৌকা এখন মাঝ নদীতে এসে পড়েছে।

আকাশ যেন ভেঙে পড়ার জোগাড় হলো। সেকি ভীষণ গর্জন করছে মেঘ-বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—ঝড় বইছে— আর বুঝি রক্ষা নেই!

এতবড় নৌকাখানার একমাত্র মাঝি শুধু ফরিদ মিয়া। অন্য কোন মাঝিকে বিশ্বাস করতে পারেননি শঙ্কর রাও, তাই ফরিদ মিয়াকে একাই আজ নৌকা বেয়ে আসতে হয়েছে।

ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফরিদ মিয়া হাঁপিয়ে উঠেছে। আর রক্ষা নেই।

ঝড় ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

মিঃ জাফরী এবং শঙ্কর রাওয়ের মন থেকে দস্যু বনহুরকে হত্যার বাসনা মুছে গেছে। নৌকাখানা যদি ডুবে যায় তাহলে তাঁদের বাঁচার কোন আশাই থাকবে না। কারণ তাঁরা সাঁতার জানেন না। আর একটু আধটু জানলেই বা কি— দুর্যোগপূর্ণ রাত্রির নদীর বুকে প্রচণ্ড ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাতার দেওয়া অতি নিপুণ সাঁতারুর পক্ষেও সম্ভব নয়!

প্রকাণ্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো মিঃ জাফরী আর শঙ্কর রাওয়ের গায়ে। ভিজে চুপসে গেলেন তাঁরা।

এমন সময় নৌকাখানা কাৎ হয়ে গেল একপাশে।

দুর্যোগপূর্ণ রাতের অন্ধকার ভেদ করে জেগে উঠলো দুটি কণ্ঠ ফরিদ মিয়া, ফরিদ মি--য়া---যা ..

আর শুনা গেল না কিছু।

ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে আসছিল একটি ছোট্ট মোটরবোট। মোটর বোটখানাতেও মাত্র তিনজন আরোহী।

বিদ্যুতের আলোতে তারা দেখতে পেল তাদের কিছু দূরে একটা নৌকা তলিয়ে গেল।

মোটর-বোটের প্রথম আরোহী বলে উঠলো—রহমান, যেমন করেহোক ঐ নৌকার যাত্রীদের বাঁচাতে হবে।

রহমান অতি কষ্টে মোটর-বোট চালিয়ে যাচ্ছিল বলে ওঠে সে— সর্দার, এ অবস্থায় নিজেদের বাঁচা কঠিন হয়ে পড়েছে, কি করে ওদের বাঁচাবেন..

মোটর-বোটের প্রথম আরোহী অন্য কেউ নয়—দস্যু বনহুর।

রহমানের কথায় বনহুর বলল— তুমি মোটর বোটখানা রক্ষা কর রহমান ---------মাহবুব আর, তুমি এই রশিখানা আমার কোমরের সঙ্গে বেঁধে মোটর-বোটের সঙ্গে আটকে নাও। বোটের তলায় যে চাল ডালের বস্তা আছে নদীতে ফেলে দাও ------আমি নিজেই রশি পরে নিচ্ছি..

বনহুর ক্ষিপ্রহস্তে নিজের কোমরে রশি বেঁধে নদীবক্ষে লাফিয়ে পড়লো। ততক্ষণে মোটর-বোটখানা অনেক চেষ্টায় ডুবন্ত নৌকার কাছে পৌছতে সক্ষম হয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন লোককে ধরে ফেললো বনহুর, তাকে নিয়ে অতি কষ্টে মোটর-বোটখানায় তুলতে সক্ষম হল। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, হঠাৎ আর একখানা কালো মাথা বিদ্যুতের আলোতে দেখা গেল।

বনহুর অতি কৌশলে সাঁতার কেটে সেই ডুবন্ত লোকটাকেও ধরে ফেলল। খুব মোটা এবং ভারী দেহ লোকটার। বনহুর ওকে নিয়ে মোটর বোটের নিকটে পৌঁছতে খুব পেরেশান হয়ে পড়লো কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটি লোককে বাঁচাতে সক্ষম হলো তারা।

বিদ্যুতের আলোতে বনহুর লোক দুটিকে লক্ষ্য করে চমকে উঠলো। একজন তার অতি পরিচিত মিঃ জাফরী। অন্যজন নৌকার মাঝি। এত বিপদেও বনহুর হেসে উঠলো।

ঝড় ধীরে ধীরে থেমে আসছে।

বনহুর বোটের মেঝেতে শায়িত সংজ্ঞাহীন লোক দুটির দিকে তাকিয়ে বলল—রহমান, জান এরা কারা?

রহমান এতক্ষণ বোটখানাকে ঝড়ের দাপট থেকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে চলেছিল এতক্ষণে একটু আশ্বস্ত হয়েছে সে। বনহুরের কথায় বললো— তা কেমন করে জানবো সর্দার!

ইনি প্রখ্যাত পুলিশ অফিসার মিঃ জাফরী। অপর জন মাঝি।

সর্দার, তাহলে...

হ্যাঁ, দস্যু বনহুরের সন্ধানেই চলেছিলেন ভদ্রলোক, হঠাৎ তঁর এই অবস্থা।

সর্দার, মিঃ জাফরী তো আপনার ভীষণ শত্রু।

হ্যাঁ, তিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি শত্রু মনে করেন।

তাহলে ওকে বাঁচিয়ে লাভ কি সর্দার? হুকুম করুন আমরা ওকে---

না রহমান, শত্রুর বিপদ-মুহূর্তে শত্রুকে আঘাত করা কাপুরুষতা, চলো, ওকে আমার লঞ্চে নিয়ে চলো।

তবে কি আমরা লঞ্চে ফিরে যাবো?

হ্যাঁ। ঝড় সম্পূর্ণ থেমে গেলে আবার আসা যাবে।

দস্যু বনহুরের মোটর-বোটখানা মিঃ জাফরী এবং সংজ্ঞাহীন মাঝিটিকে নিয়ে বনহুরের লঞ্চের গায়ে এসে ভিড়ল। আকাশ তখন পরিষ্কার হয়ে এসেছে। নদীবক্ষ এখন শান্ত ধীর স্থির।

মিঃ জাফরী এবং মাঝিটিকে যত্ন সহকারে লঞ্চে উঠিয়ে নেয়া হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞা ফিরে এলো মিঃ জাফরীর. ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। শুভ্র কোমল বিছানায় তাঁকে শোয়ানো হয়েছিল।

মিঃ জাফরী উঠে বসতেই একজন লোক এক গ্লোস গরম দুধ এনে তাঁর হাতে দিল— খেয়ে নিন।

মিঃ জাফরী দুধের গ্লোস হাতে নিয়ে স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন এখন তিনি কোথায়।

অল্পক্ষণের মধ্যে মনে পড়ে গেল তার সব কথা—সেই নৌকা, সেই মাঝি, সেই প্রচণ্ড ঝড়ের কথা— তিনি তো নদীতে ডুবে গিয়েছিলেন— এখানে এলেন কি করে। এরা কারা কেমন করে তাঁকে উদ্ধার করেছে? মিঃ রাও এবং মাঝিই বা গেল কোথায়?

গরম দুধটুকু খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন মিঃ জাফরী। তিনি নিজের শরীরে শুকনো জামাকাপড় দেখলেন— বুঝতে পারলেন যারা তাকে উদ্ধার করেছেন তারাই তাঁর দেহ থেকে ভিজে জামাকাপড় খুলে নিয়ে এসব পরিয়ে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতায় মিঃ জাফরীর মন ভরে উঠলো। তিনি এবার লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কে তাকে রক্ষা করেছেন, তিনি কোথায়?

লোকটা জরাব দিল—আমাদের মনিব স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করেছেন—তিনি সময় হলেই দেখা করবেন।

কে তিনি? কি নাম তাঁর?

তিনি একজন হৃদয়বান লোক। মনিবের নাম আমরা উচ্চারণ করি না।

মিঃ জাফরী পুনরায় বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। হঠাৎ মনে পড়লো মিঃ শঙ্কর রাওয়ের কথা। এবার তিনি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার সঙ্গীটি কোথায়?

আছে ,পাশের ক্যাবিনে।

আশ্বস্ত হলেন মিঃ জাফরী। যাক তাহলে মিঃ শঙ্কর রাও-ও বেঁচে গেলেন।

নিশ্চিন্ত মনে চোখ বন্ধ করলেন মিঃ জাফরী। বোটের ঝক ঝক আওয়াজ তাঁর চিন্তাধারাকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো। তিনি ভাবতে লাগলেন, কোথায় দস্যু বনহুরকে হত্যা করে তার লাশ নিয়ে ফিরে যাবেন— আর কিনা নিজেই মৃত্যুপথের যাত্রী হয়ে কোনরকমে প্রাণ ফিরে পেয়ে কার না কার লঞ্চের ক্যাবিনে শুয়ে আছেন। কিন্তু তিনি যে প্রাণে বেঁচে আছেন এটাই তাঁর ভাগ্য। কে সে মহান ব্যক্তি যিনি নিজের জীবন বিপণ্ন করে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে গভীর জলের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। মনে মনে বারবার তাকে ধন্যবাদ জানান মিঃ জাফরী।

হঠাৎ পদশব্দে চোখ তুলে তাকান, দেখতে পান পূর্বের সেই লোকটি ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললো— আমাদের মনিব আসছেন।

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় চক্ চক্ করে উঠলো মিঃ জাফরীর চোখ দুটো। উন্মুখ হৃদয় নিয়ে তাকালেন ক্যাবিনের দরজার দিকে। এক্ষুণি তিনি দেখতে

পাবেন তাঁর প্রাণরক্ষাকারীকে। কি বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাবেন ভাবতে লাগলেন মিঃ জাফরী।

ভোরের আলো তখন ক্যাবিনের মেঝেতে এসে পড়েছে।

মিঃ জাফরী তাকিয়ে রইলেন দরজার দিকে।

ক্যাবিনে প্রবেশ করলো দস্যু বনহুর। শরীরে তার সাধারণ পাজামা পাঞ্জাবী, পায়ে পানসু। স্বাভাবিক সচ্ছ মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল দীপ্ত চোখ দুটো। মুখে মৃদু হাসির রেখা। মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললো— গুড মর্নিং ইন্সপেক্টার।

অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন মিঃ জাফরী— গুড মনিং।

যাকে দেখার জন্য এতক্ষণ উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করছেন মিঃ জাফরী, এই সেই ব্যক্তি। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন, কোথায় যেন একে দেখেছেন বলে মনে হয় তাঁর। কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত বলে মনে হয়। এতক্ষণ যে একটা বিপুল আগ্রহ নিয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন, সব যেন কর্পূরের মত কোথায় উড়ে গেল! এ যে তার অতি পরিচিত মুখ। একবার নয় অনেকবার বিভিন্ন রূপে তিনি এ মুখ দেখেছেন। পুলিশ বিভাগের সুদক্ষ কর্মচারী মিঃ জাফরী। তাঁর শ্যেনদৃষ্টির কাছে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। মিঃ জাফরী চিনতে পারলেন দস্যু বনহুরকে।

দস্যু বনহুরের মুখে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। হেসে বলে—চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়ই?

মিঃ জাফরীর মুখ গম্ভীর হয়ে এসেছে। দস্যু বনহুর তাঁর প্রাণরক্ষাকারী যার রক্তে তিনি মধুমতী চর ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেই দস্যু তাঁকে বাঁচিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে নেন মিঃ জাফরী।

বনহুর পূর্বের ন্যায় সচ্ছকণ্ঠে বলে— জানি আপনি কি ভাবছেন।

মিঃ জাফরী পুনরায় তাকালেন। অদ্ভুত এই দস্যু বনহুর, একবার তাকালে সহজে চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না। মিঃ জাফরীও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলেন না।

বনহুর বলল— আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে ঐ ঝড়। আমারও। শান্ত কণ্ঠে কথা বলল সে।

মিঃ জাফরী স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন, কোন উত্তর দেন না।

মিঃ জাফরী যতই ভাবছেন ততই আশ্চর্য হচ্ছেন। দস্যু বনহুর তাঁর সবকিছুই জানে। তিনি যে আজ রাতে বনহুরকে হত্যা বা গ্রেফতারের জন্যই যাচ্ছিলেন তাও বুঝতে পেরেছে, অথচ তার প্রতি এতটুকু অসৎ ব্যবহার করেনি বা করছে না সে। মনের মধ্যে একটা কৃতজ্ঞতা ভাব জাগে মিঃ জাফরীর। ইচ্ছা করলে এখনই সে তাঁকে হত্যা করতে পারে— যা খুশি করতে পারে, কিন্তু সে এখন পর্যন্ত কোন অভদ্র ব্যবহার করেনি...

হঠাৎ মিঃ জাফরীর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে, দস্যু বনহুর বলে—কি ভাবছেন ইন্সপেক্টার?

কিছু না।

নিশ্চয়ই কিছু ভাবছিলেন।

ভাবছিলাম, শঙ্কর রাও কেমন আছেন।

শঙ্কর রাও!

হ্যাঁ, তিনি এখন কেমন আছেন?

শঙ্কর রাও ছিলেন নাকি আপনার সঙ্গে?

কেন, তাঁকেও নাকি তুমি উদ্ধার করেছ শুনলাম।

না, আপনার সঙ্গে যাকে নদীবক্ষ থেকে আমি তুলে এনেছি সে মিঃ রাও নয়, একজন মাঝি।

এতক্ষণে বুঝতে পারলেন মিঃ জাফরী, তাঁর সঙ্গে যাকে উদ্ধার করা হয়েছে সে মিঃ শঙ্কর রাও নয়, তাঁর নৌকার মাঝি। একটা ব্যথার ছোঁয়া লাগলো মিঃ জাফরীর মনে— তাহলে মিঃ রাও আর বেঁচে নেই।

দস্যু বনহুর সান্ত্বনার স্বরে বললো—দুঃখ করে কোন লাভ নেই ইন্সপেক্টার। অদৃষ্টে যার যা আছে তা হবেই। আচ্ছা এখন চলি, গুডবাই...

দস্যু বনহুর বেরিয়ে যায় মিঃ জাফরীর ক্যাবিন থেকে।

মিঃ জাফরী ভাবতে থাকেন, এ কি হলো, যাকে গ্রেফতার করতে এসেছিলেন তার হতেই বন্দী হলেন!

◆

মিঃ হারুন অফিসে বসে ডায়েরী লিখছেন। মিঃ হোসেন এবং অন্যান্য অফিসার যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

গত রাতে মিঃ জাফরী এবং শঙ্কর রাও মধুমতী চলে গেছেন। এখনও ফিরে আসেননি, এ নিয়েই চিন্তা করছিলেন মিঃ হারুন। কথাটা অফিসের আর কেউ জানে না, মিঃ জাফরী শুধু মিঃ হারুনকে ব্যাপারটা গোপনে জানিয়েছিলেন।

মিঃ হারুন নিজেও মিঃ জাফরীর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিঃ জাফরী তাতে রাজী হননি। তিনি বলেছিলেন, একা গিয়ে দেখতে চাই কি করতে পারি। মিঃ রাওকে সঙ্গে নিয়েছিলেন, যদি ছদ্মভাবে কিছু করা যায় তাঁকে দিয়ে করাবেন। যেমন কোন ভিখারী কিংবা কোন চাষীর বেশে ওকে পাঠিয়ে নিজে সুযোগ নেবেন।

গতরাতে যে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গেছে, এ জন্যই চিন্তা হচ্ছিল মিঃ হারুনের। এতক্ষণ ফিরে না আসারই বা কারণ কি? যদিও মিঃ হারুন ডায়েরী লিখছিলেন, কিন্তু তাঁর মনে ঐ এক চিন্তা আলোড়ন জাগাছিল – মিঃ জাফরী ও শঙ্কর রাও কোন বিপদে পড়েননি তো...

হঠাৎ মিঃ হারুনের চিন্তাজাল ছিন্ন করে ফোনটা বেজে ওঠে।

মিঃ হারুন ডায়েরীতে হাত চালাতে চালাতে বাম হাতে রিসিভারখানা তুলে নেন— হ্যালো! সঙ্গে সঙ্গে হাতের কলম রেখে সোজা হয়ে দক্ষিণ হাতে রিসিভার চেপে ধরেন কানে– হস্‌পিটালে মিঃ শঙ্কর রাও! নদী থেকে তাঁকে জেলেরা নৌকায় উঠিয়ে এনেছে! জীবিত আছেন তো?

মিঃ হারুন যখন রিসিভারে কথা বলছিলেন, তখন অন্যান্য পুলিশ কর্মচারী স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন।

মিঃ হারুন রিসিভার রেখে উঠে দাঁড়ান, তারপর মিঃ হোসেনকে লক্ষ্য করে বলেন— আপনি এক্ষুণি আমার সঙ্গে চলুন। মিঃ রাও হসপিটালে আছে। তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন হসপিটালে পৌঁছে অবাক হলেন।

পথে গাড়িতে মিঃ হারুন গত রাতের কথাগুলো মিঃ হোসেনকে বলেছিলেন।

মিঃ শঙ্কর রাওয়ের জ্ঞান ফিরে এলো সন্ধ্যার দিকে।

মিঃ হারুন এবং অন্যান্য সবাই দুঃখে মুষড়ে পড়লেন। মিঃ জাফরী ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পাননি। নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

ব্যাপারটা পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের কানে পৌছল। গোটা পুলিশ বিভাগ শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। মিঃ জাফরীর মত একজন বিশিষ্ট পুলিশ কর্মচারীর অন্তর্ধানে একটা গভীর বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এলো পুলিশমহলে।

মিঃ শঙ্কর রাও যখন জানতে পারলেন মিঃ জাফরীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, এমনকি তাঁর লাশও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন।

মাঝিরা জাল দিয়ে নদীতে অনুসন্ধান করলো, কিন্তু কোথাও তারা খুঁজে পেল না মিঃ জাফরীর লাশ।

এখানে যখন মিঃ জাফরীর মৃত্যুশোকে সকলে মুহ্যমান তখন দস্যু বনহুরের সঙ্গে বসে ডিনার খাচ্ছেন মিঃ জাফরী।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালো দস্যু বনহুর, মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললো– চলুন ইন্সপেক্টার, আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।

লঞ্চ থেকে নেমে একটা বোটে চেপে বসলো বনহুর এবং মিঃ জাফরী। ইতিমধ্যে সেই মাঝিটাকেও মোটরবোটে তুলে নেয়া হয়েছে।

জায়গাটা যে কোথায় বুঝা গেল না। লঞ্চ ছেড়ে মোটর-বোট তীর বেগে এগিয়ে চলল।

মিঃ জাফরী অবাক হয়ে দস্যু বনহুরকে দেখছেন।

দস্যু বনহুর স্বয়ং মোটর-বোটখানা চালিয়ে চলেছে। হেসে বলল বনহুর– রিভলবার থাকলে হয়তো এতক্ষণ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতেন, তাই না ইন্সপেক্টার?

মিঃ জাফরী কোন কথা বললেন না।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা নৌকা দেখতে পেলেন মিঃ জাফরী। নৌকাখানা নিয়ে একজন মাঝি মাঝনদীতে অপেক্ষা করছে। মনে হচ্ছে এদের জন্যই প্রতীক্ষা করছে সে।

বনহুর নৌকাখানার অদূরে এসে বোটখানা থামিয়ে ফেললো, তারপর নৌকার মাঝিকে ইংগিতে নিকটে আসতে বললো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মোটর-বোটের ধারে এসে নৌকাখানা ভিড়লো।

বনহুর এবার মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললো- এখান থেকে ঘাট বেশি দূরে নয়। মাঝিই আপনাকে নিয়ে যাবে।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ জাফরীর সঙ্গী সেই মাঝি মোটর-বোট থেকে নৌকাখানায় চেপে বসলেন। যে মাঝি এতক্ষণ নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল সে উঠে এলো মোটর-বোটে।

মিঃ জাফরী নৌকায় চেপে বসলেন। মাঝি বৈঠা হাতে তুলে নিল।

দস্যু বনহুর হাত নেড়ে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

ক্রমে নৌকাখানা সরে যাচ্ছে।

মোটর বোটখানাও দূর হতে দূরে সরে যাচ্ছে।

মিঃ জাফরী তখনও তাকিয়ে আছেন দস্যু বনহুরের মোটর-বোটখানার দিকে।

ঘাটে পৌঁছতে বেশি সময় লাগলো না তাঁদের।

কিন্তু যেখানে তখন তাঁরা পৌঁছলেন সেটা তাঁদের পরিচিত কোন জায়গা নয়। সেখান থেকে ফিরে এলেন শহরে। পুরো একটা দিন কেটে গেল তাঁদের ট্রেনে।

মিঃ জাফরীকে ফিরে পেয়ে পুলিশমহলে আনন্দের বান বয়ে চলল। সবাই তাঁকে নিয়ে খুশিতে মেতে উঠলেন। নদীতে ডুবেও সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন মিঃ জাফরী, এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়! কম আশ্চর্যের কথা নয়! কেমন করে তিনি প্রচণ্ড ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পেলেন, এ নিয়ে সকলের মধ্যে একটা প্রশ্নের জাল ছড়িয়ে পড়লো। আসল জবাব কেউ খুঁজে পেলেন না।

মিঃ জাফরী ঘটনাটা কাউকেই খুলে বললেন না। মাঝিটা অবশ্য জানে- কিন্তু কে যে লঞ্চের মালিক, কে তাদের মোটরবোটে করে নৌকায় পৌঁছে দিল, তার আসল পরিচয় সে জানে না। জানার কোন প্রয়োজনও তার ছিল না।

কাজেই মিঃ জাফরীকে কে রক্ষা করেছে, এ কথা সকলের কাছেই গোপন রয়ে গেল।

মিঃ আহমদ নিজে এসে মিঃ জাফরীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

◆

নূরীর চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলে নাসরিন—সব সময় তুই কেঁদে কেঁদে সারা হলি নূরী। যে তোকে চায় না, কেন তুই তার জন্য এত করিস!

নাসরিন, তুই কি বুঝবি! আমার হৃদয়ের ব্যথা তুই কি বুঝবি!

জানি তুই ওকে নিজের জীবনের চেয়েও ভালবাসিস্। কিন্তু নূরী, প্রতিদানে সে তোকে কি দিয়েছে? দিয়েছে তোকে ব্যথা আর বেদনা। তার চেয়ে তুই অন্য কাউকে বিয়ে করে নে নূরী।

নূরী বাল্যসখী নাসরিনের কথায় চমকে ওঠে। তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে—আর কোনদিন অমন কথা বলিসনে নাসরিন। বিয়ে কোনদিন দু'বার হয় না।

নূরী, এই কথা বলে বলেই জীবন কাটিয়ে দিবি?

হ্যাঁ নাসরিন, তাছাড়া আর যে কোন পথ নেই আমার। হুরই যে আমার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন....

কি জানি নূরী, আমি জীবনে এমন কোনো পুরুষ দেখিনি যে পুরুষ তোর মত একজন মেয়েকে উপেক্ষা করতে পারে। তোর মত সুন্দরী খুব কমই হয়!

আমার চেয়ে আমার হুর অনেক সুন্দর নাসরিন। ওর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ায় নূরী আর নাসরিনের পাশে।

নূরী আনন্দভরা কণ্ঠে বলে ওঠে— হুর এসেছে?

হ্যাঁ, এসেছে।

নাসরিনের মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায় নূরী। আর একবার তাকায় রহমানের মুখে, তারপর ছুটে চলে যায় সেখান থেকে।

রহমান নূরীর গন্তব্যপথের দিকে তাকিয়ে হাসে। নাসরিন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। রহমানকে লক্ষ্য করে বলে- সর্দারকে ভালবেসে নূরী মরবে।

রহমান গম্ভীর কণ্ঠে বলে— তবু সর্দারের নাগাল পাবে না।

সত্যি, পুরুষ জাতটাই বড় নিষ্ঠুর।

রহমান নাসরিনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো- সব পুরুষই সমান নয় নাসরিন। তুমি তো জানো, নূরীর জন্য আমাদেরই দলের কত পুরুষ পাগল। ওর একটু ভালবাসার জন্য কতজন আকুল হৃদয় নিয়ে অপেক্ষা করে, কিন্তু সর্দারের ভয়ে কেউ ওকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

অভিমানভরা কণ্ঠে বলে নাসরিন—জানি, তুমিও ওকে ভালবাস রহমান।

সে কথা মিথ্যা নয় নাসরিন, নূরীকে সত্যি আমার ভাল লাগে।

উঃ!

কি হলো নাসরিন?

কিছু না। যাই দেখি জরিনা কোথায় গেল।

নাসরিন চলে যায়।

রহমান মৃদু হাসে, সে জানে নাসরিন তাকে মনে মনে ভালবাসে, কিন্তু প্রকাশ্যে কোনদিন সে জানায়নি তার মনের গোপন কথা।

বনহুরের সামনে এসে দাঁড়ায় নূরী, কোন কথা বলতে পারে না সে।

বনহুর কোমরের বেল্ট থেকে রিভলবারখানা টেবিলে রেখে শয্যায় গিয়ে বসে, তারপর নূরীকে লক্ষ্য করে বলে- কেমন আছো?

নূরী শান্তকণ্ঠে বলে- ভাল।

বস নূরী, একটা নতুন গল্প আছে?

কাউকে গুলিবিদ্ধ করেছো, না গলাটিপে হত্যা করেছ?

দস্যু বলে আমি শুধু হত্যা করি, তাই না?

নাহলে কাউকে মোটা টাকা বখশিস দিয়েছ, কিংবা ধন রত্ন-অলঙ্কার।

ওসব নয় নূরী।

তবে কি?

বস, বলছি।

নূরী বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে যায় বনহুরের হাতে, চমকে ওঠে নূরী–ইস, হাতে কি হয়েছে তোমার? নূরী বনহুরের হাতখানা, তুলে নেয় তার হাতে। এ যে কামড়ানোর দাগ! কে তোমায় কামড় দিয়েছে হুর?

নূরী, সে এক ভীষণ কাণ্ড... কোন্‌টা শুনবে, যা বলতে চাইছিলাম সেটা না আমার হাতের এ দাগটা..... বলো?

দুটোই তোমাকে বলতে হবে।

উহুঁ, যা শুনবে একটা।

আমি কোনটাই শুনতে চাই না।

বেশ, আমিও বলবো না।

হুর, এখনও তোমার ছেলেমানুষি গেল না। আমার কাছে কথা লুকিয়ে তোমার কি লাভ হয় বলতো?

তবে শুনো, এবার মধুমতী চরে বন্যাপীড়িতদের সাহায্য দিতে গিয়ে সে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। ইন্সপেক্টার মিঃ জাফরী কেমন করে জানতে পেরেছিলেন, মধুমতী চরে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে পাওয়া যাবে দস্যু বনহুরকে, তাই গোপনে চলেছিলেন তাকে হয় বন্দী, নয় হত্যা করে পুলিশমহলে সুনাম ছড়াতে----ঘটনাটা বিস্তারিত বলে যায় বনহুর নূরীর কাছে। তার হাতের ক্ষতের কথাটা নূরী যাতে ভুলে যায় এই হলো বনহুরের ঘটনাটা ইনিয়ে বিনিয়ে বলার উদ্দেশ্য।

নূরী অবাক হয়ে সব শুনলো, তারপর বললো– এমন একজন শত্রুকে হাতের মুঠায় পেয়ে তুমি ছেড়ে দিলে হুর! সে যদি তোমাকে অমন অবস্থায় পেতো তাহলে কি করতো জানো?

হত্যা কিংবা গ্রেফতার।

আর তুমি তাকে জামাই আদরে ডাঙ্গায় পৌছে দিলে।

দস্যু হলেও বনহুর মানুষ! সে কোন অসহায়ের প্রতি আঘাত করে না– ঘোর শত্রু হলেও না।

শুধু তুমি আঘাত করো একজনকে! যাকে আঘাত করেও দুঃখ পাও না।

কে সে আমার পরম বন্ধু যাকে আমি আঘাত করে আনন্দ পাই?

সত্যি সে তোমার পরম বন্ধু?

তার চেয়েও বেশি যাকে আমি আঘাত করে আনন্দ পাই।

হুর!

বল?

বল হুর, কেমন করে তোমার হাতে ঐ ক্ষত হলো?

নূরী এত কথার মধ্যেও তার হাতের ক্ষতটার কথা ভুলে যায়নি, বনহুর মনে মনে চমকে উঠলো। হেসে বললো সে– তোমার স্মরণশক্তি দেখছি ভয়ানক।

তুমি মনে করেছিলে আমি বুঝি ভুলে গেছি?

ঠিক তা নয়, কারণ কেমন করে আমার হাতে ক্ষত হলো সেই কথাই আমি ভুলে বসে আছি। দাঁড়াও স্মরণ করে দেখি কি করে এ ক্ষতটা হলো।

মানে কে তোমার হাত কামড়ে দিয়েছিল?

ওঃ হ্যাঁ, কামড়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে–ঐ যে শহরে একটা বাড়ির কুকুর কামড়ে দিয়েছে হঠাৎ.......

এটা কুকুরের কামড়ের দাগ? না না, কিছুতেই নয়।

তবে কিসের?

মানুষের দাঁতের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।

হুঁ-তাহলে তুমি ঠিক ধরেছ নূরী, স্বপ্নঘোরে নিজের হাত নিজেই কামড়ে দিয়েছি।

ঠাট্টা রাখ বলছি।

বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?

না, সত্যি কথা বল?

মিথ্যা না বলে যে উপায় নেই নূরী।

আর সত্য বললে?

তুমি আবার কামড়ে দেবে।

সব সময় এমন হেঁয়ালিভরা কথা আমার.....

ভাল লাগে না, এই তো?

হ্যাঁ।

একটা মেয়ে আমার হাতে কামড়ে দিয়েছিল।

মিথ্যা কথা!

জানি তুমি বিশ্বাস করবে না।

থাক আমি শুনতে চাই না। চলো হাত-মুখ ধুয়ে খাবে চলো।

সেই ভাল। চলো।

বনহুর আর নূরী কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় নূরীর। শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। অতি ধীরে লঘু পদক্ষেপে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে, এগিয়ে যায় বনহুরের কক্ষের দিকে। অতি সন্তর্পণে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দেয় নূরী। দেখতে পায়– বিছানা শূন্য, বনহুর বিছানায় নেই। নূরী তাকায় কক্ষের চারদিকে, ওপাশে দেয়ালে বনহুরের পোশাকগুলো ঠিক জায়গায় ঝুলছে।

তবে সে গেল কোথায়? টেবিলে তার রিভলবার যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

নূরীর দু'চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। বনহুরের শূন্য কক্ষে দাঁড়িয়ে তার শূন্য হৃদয় খাঁ খাঁ করে উঠলো। টেবিল থেকে বনহুরের রিভলবারখানা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো নূরী।

◆

অতি সন্তর্পণে জানালা খুলে কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর। কক্ষের নীলাভ আলোতে তাকিয়ে দেখলো দুগ্ধফেনিল বিছানায় ঘুমিয়ে আছে মনিরা। এক থোকা যুঁই ফুলের মত ছড়িয়ে আছে তার দেহখানা। একরাশ ঘন কালো চুল এলোমেলো হয়ে লুটিয়ে পড়েছে তার বুকের উপর।

বনহুর ধীরে ধীরে মনিরার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো। নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলো মনিরার ঘুমন্ত মুখের দিকে।

কক্ষের নীলাভ আলোয় মনিরার মুখখানা অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। দস্যু বনহুর নিজকে সংযত রাখতে পারে না, বসে পড়ে মনিরার বিছানায়। ধীরে ধীরে ঝুঁকে আসে বনহুরের মুখখানা মনিরার মুখের ওপর।

একটা উষ্ণ নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙে যায় মনিরার। চোখ মেলে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমজড়িত চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে ওঠে। ভাল করে চোখ রগড়ে তাকায় সে- আনন্দ- উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে মনিরার মন, দু'হাত প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরে বনহুরের গলা, বলে- একি স্বপ্ন - না সত্য?

উঁ হুঁ।

তবে কি?

শুধু তুমি আর আমি। বাস্তব- মনিরা জানো, আজ আমি কেমন করে এসেছি?

কেমন করে?

হাওয়ায় ভেসে।

মনির!

বল?

জানো, আজ কত খুশি হয়েছি।

মনিরা ওকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয় বনহুর।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় আঘাত হয়- ঠক্ ঠক্ ঠক্ -----

সঙ্গে সঙ্গে সরকার সাহেবের ভীত কণ্ঠস্বর- পুলিশ—পুলিশ—

বনহুর আর মনিরা তাকায় উভয়ের মুখের দিকে।

দরজায় তখনও আঘাতের পর আঘাত চলেছে।